দক্ষিণাপথে

মানদা চরণ সাহা

পরিবেশক
ডি. এম. লাইব্রেরী
৪২নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
কলিকাতা

প্রথম প্রকাশ :
১৬ই পৌষ, ১৩৬২

প্রকাশক :
শ্রীগোপালদাস মজুমদার
ডি, এম, লাইব্রেরী
৪২নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

প্রচ্ছদপট ও অঙ্গচিত্র :
তিলক বন্দোপাধ্যায়

ব্লক ও প্রচ্ছদমুদ্রণ :
ইউনিটি রি প্রোডাকসন সার্ভিস,
কলিকাতা

মুদ্রাকর :
শ্রীবিনয়রতন সিংহ
ভারতী প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
১৪১ বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা-৬

প্রুফ সংশোধনে—
শ্রীখগেন্দ্রনাথ গায়েন, বি. এস্-সি. বি. টি

ধর্ম ও দর্শনের সমন্বয় সাধক

শ্রীশ্রীঠাকুর সত্যানন্দদেবের

পুণ্যচরণে—

শ্রীভগবানের কৃপা লাভ করিবার অন্যতম মুখ্য উপায় সাধুসঙ্গ। সাধু বলিতে তীর্থস্থানকেও বুঝায়। তীর্থদর্শনে অন্তঃকরণ নির্মল হয়। নির্মল অন্তঃকরণে শ্রীভগবানের উপাসনাই শাস্ত্রের নির্দেশ। যাঁহারা তীর্থপর্য্যটনে অক্ষম, তাঁহাদের পক্ষে শাস্ত্রাদিবর্ণিত তীর্থমাহাত্ম্য আলোচনা করা বিধেয়। 'দক্ষিণাপথে' গ্রন্থখানিতে সুষ্ঠ সুললিত ভঙ্গীতে দাক্ষিণাত্যের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ তীর্থগুলির বর্ণনা পাঠ করিয়া সাতিশয় প্রীতি লাভ করিয়াছি। আমি বিশ্বাস করি, এই গ্রন্থ পাঠ করিলে কল্যাণ হইবে।

ইতি

শ্রীগৌরীনাথ শাস্ত্রী

সংস্কৃত কলেজ, কলিকাতা।

৮-১২-৫৫

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ
১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৭

শ্রীযুক্ত মানদাচরণ সাহা মহাশয় কিছুকাল আগে দক্ষিণাপথে কয়েকজন সুশিক্ষিত ভদ্রলোকের সহযাত্রী হয়ে ভ্রমণ করতে গিছলেন। ভারতবর্ষের এই দক্ষিণ অংশ নানা বিষয়ে সুবিখ্যাত। বিশেষতঃ মাদ্রাজ অঞ্চলের অধিবাসীদের জ্ঞানবিদ্যা শিল্পকলা এবং ধর্ম্মাচরণে অনুরাগ ভারতবর্ষের অনেকের কাছেই সুবিদিত। এখানকার স্থানে স্থানে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, বহু তীর্থস্থানে শিল্পশ্রীময় সুরম্য মন্দির, অনেক রকমের বিদ্যাচর্চ্চা ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান বিশেষভাবে দর্শনীয়। এখানকার নানা ব্যাপারের অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া স্বল্পকালের ভ্রমণকারীর পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না। তবুও যে কোন তীক্ষ্ণদৃষ্টি ও

চিন্তাশীল ভ্রমণকারী স্বল্প সময়ের মধ্যে এইসব স্থান ঘুরে ফিরে যে বিবরণ তাঁদের লেখায় প্রকাশ করেন তা থেকেও অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আমরা জেনে উপকৃত হই।

'দক্ষিণাপথে' নাম দিয়ে শ্রীমানদাচরণ সাহা দক্ষিণভারতে তাঁর ভ্রমণকালে যে সব বিবরণ তাঁর বইখানিতে লিখেছেন তাই থেকে পাঠকেরা মাদ্রাজ ও তার আশেপাশের আঞ্চলিক জনপদের সম্বন্ধে নানাবিষয়ে কিছু কিছু নতুন কথাও জানতে পারবেন। তাঁর এই বিবরণ শুধু নিছক মামুলী বর্ণনা কাহিনী নয়। বর্ণনার মধ্যে সরসতা থাকার জন্যে পাঠকরা এই বইখানা পড়ে আনন্দ পাবেন। আমি তাঁর এই প্রচেষ্টার সাফল্যের জন্যে বিধাতার কাছে আন্তরিক প্রার্থনা জানাচ্ছি। ইতি

৩০ ডিসেম্বর ১৯৫৫

স্বামী বেদানন্দ
সম্পাদক, বিশ্ববাণী

ভূমিকা

ছেলেবেলা থেকেই বেড়াতে ভালবাসতাম। পিতৃদেব পশ্চিমে চাকরী করতেন—পূজার সময় বাংলামায়ের কোলে ফিরে আসার সুযোগ প্রায় প্রতিবছরই পেয়েছি; শৈশব থেকেই জেগেছে বেড়ানর ইচ্ছা। স্কুলে ইতিহাসের পাতায় গ্রীক অভিযানের কথা পড়তে পড়তে কল্পনায় দেখেছি হিন্দুকুশ হিমালয়ের তুষারশুভ্র চূড়া। পর্ত্তুগীজ নাবিকদের সমুদ্রপথে ভারতে আসার কথা শুনতে গিয়ে আমি যেন দেখেছিলাম আরব সাগরের কূলে কালিকটের বন্দর আর পর্ত্তুগীজদের পালতোলা জাহাজ। তীর্থযাত্রী আর পরিব্রাজকদের মুখে নানা গল্প শুনে আমার এই বেড়াবার ইচ্ছা বেড়েই চলেছিল। ৺কেদারনাথ, বদরীনাথের কথা শুনে একান্ত ইচ্ছা হয়েছিল গগনচুম্বী হিমালয়কে দেখার। আমি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র—বাবা, মা দাক্ষিণাত্যে গিয়েছিলেন। তাঁদের মুখে দক্ষিণ ভারতের নানা গল্প শুনে জেগেছিল সেই কৃষ্ণা, কাবেরী আর মন্দিরের দেশ দাক্ষিণাত্যকে দেখার ও জানার ইচ্ছা।

ঐকান্তিক ইচ্ছা হলে সেটা নাকি অপূর্ণ থাকে না শুনেছিলাম। সারা দেশ ঘুরে দেখবার ইচ্ছা যখন প্রবল থেকে প্রবলতর হতে লাগল—এল ভারতীয় রেলপথের শতাব্দী-উৎসব, আর সেই উপলক্ষে অল্পভাড়ায় বেড়ানর সুবিধা। উত্তর ভারত দেখেছি—হিমালয়ের দেবতার মন্দিরে পূজা দেবার সুযোগ হয়ত আজও পাইনি কিন্তু তার সেইঅপরূপ রূপ দেখে, প্রকৃতির অবর্ণনীয় সৌন্দর্য্যকে অনুভব করে, দেবতার মহিমা বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে দেখতে পেয়েছি। কিন্তু দক্ষিণকে ত' দেখা হয়নি। আমার ভুবনমনোমোহিনী দেশমাতৃকার তুষারশীর্ষ কিরীট

দেখেছি, কিন্তু মহাসমুদ্রের নীল জল মায়ের পা যেখানে ধুয়ে দিয়ে যাচ্ছে, সসীম আর অসীমের মিলন যেখানে—সেটাত' দেখা হয়নি। মোগল স্থাপত্য শিল্প, আগরা, দিল্লী দেখেছি, কিন্তু হিন্দুরাজাদের কীর্ত্তি, অতীত ভারতের আর একটি বিরাট অংশকে ত' দেখিনি। তাই স্থির করলাম, যাব দক্ষিণাপথে – দেখব ত্রিচিনাপল্লী তাঞ্জোর, মাদুরা আরও অনেক দূর ……। যাত্রার লক্ষ্য ঠিক হ'ল— মহাসমুদ্রের মিলনক্ষেত্র, ভারতের শেষবিন্দু, কুমারিকা অন্তরীপ। কলেজের কয়েকজন সহকর্মীর সঙ্গে এবিষয়ে পরামর্শ করে তাঁদের সমর্থন ও সহযেগিতা পেলাম। শুধু তাই নয়, এঁদের সঙ্গী হিসাবে পেয়ে উৎসাহিতও হলাম এই দূরের পাল্লায়। বন্ধুবান্ধবও ২।১ জন সঙ্গী হলেন। লেখক শ্রীমানদাচরণ সাহা বি. এ. আমার ছোট ভায়ের মত। সেও আমাদের সঙ্গে ঘোরার ইচ্ছা প্রকাশ করায় আমরা সানন্দে তাকেও সঙ্গে নিলাম। ১৩ই মে ১৯৫৩, বিকালে, আমাদের সকলকে নিয়ে মদ্রাস্ মেল হাওড়া ছাড়ল।

'দক্ষিণাপথে' দক্ষিণ ভারতেরই পরিচয়। প্রাচীনকাল থেকে দাক্ষিণাত্য ভারতবর্ষের ও ভারতবাসীর জীবনে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। দক্ষিণ ভারত শুধু দ্রাবিড় সভ্যতার কথাই মনে করিয়ে দেয়না, হিন্দুরাজাদের কীর্ত্তি আজও বহন করে সেই অতীত গৌরবময় যুগের সাক্ষ্য দিচ্ছে। যখন আমরা হিন্দুরাজাদের সাহায্যে তৈরী প্রাচীন যুগের মন্দির ও দেবালয়, প্রাসাদ বা সুন্দর ও সূক্ষ্ম কারুকার্য্যের সামনে উপস্থিত হয়েছি তখন অবাক হয়ে দেখেছি—ভেবেছি যে দেশ আজ থেকে ১৫০০।২০০০ হাজার বছর আগে এইসব কাজ করেছে সে দেশের সভ্যতা, সংস্কৃতি, শিল্প, সৌন্দর্য্যজ্ঞান কত প্রাচীন, কত প্রাচীন সেই দেশ। এইসব দেখার পর, অনুভব করেছি আমাদের আত্ম-বিস্মৃতি; ভেবেছি আমাদের দেশের ভাণ্ডারে যে বিবিধ রত্নরাজি

আছে তার সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান কত অল্প। তখনই জেগে উঠেছে আমার দেশকে গভীরভাবে জানার ইচ্ছা। কন্যাকুমারিকায় দাঁড়িয়ে যখন দূরদিগন্তে আকাশ ও নীলজলরাশির মিলন আর সামনে মহাসমুদ্রের আলিঙ্গন দেখেছি, এই মহামিলনের ক্ষেত্র প্রভাতসূর্য্যের আলোয় যখন উদ্ভাসিত হয়েছে, তারই মধ্যে চিরসুন্দরকে উপলব্ধি না করে পারিনি। রামেশ্বরম্, ধনুষ্কোডি, মহাবলীপুরমের সমুদ্রতীরে বসে কতবার মনে হয়েছে—শ্রীরামচন্দ্র, বিজয়সিংহের লঙ্কা অভিযানের কথা; অঙ্কোরভাট, বোরোবুদুর আর দূরপ্রাচ্যে ভারতের সাংস্কৃতিক অভিযানের কথা। এই পথেই ত' তাঁরা গিয়েছিলেন। দূরত্ব বা মহাসমুদ্রের অতল জলরাশি বা অজানার আশঙ্কা, কিছুই ত' তাঁদের ধরে রাখতে পারেনি। সম্রাট অশোক, মহাত্মা গান্ধী, রবীন্দ্রনাথের দেশ ভারতবর্ষ—দূর থেকে দূরান্তরে নিজেকে জানাবার জন্য, অপরকে জানবার জন্য চিরদিনই সচেষ্ট ছিল—হিংসা বা লোভের পথে প্রতিষ্ঠা সে চায়নি, তার পথ প্রীতি, সৌহার্দ ও প্রেমের। এইসব চিন্তার মধ্যে যেন পেয়েছিলাম আমাদের এই দাক্ষিণাত্য পরিক্রমার তাৎপর্য্য। অনুভব করেছিলাম আমাদের জাতীয় জীবনে দেশভ্রমণ আজ কত প্রয়োজনীয়। আমাদের দেশে সত্য ও সুন্দরের সন্ধানই শুধু এতে পাই না; এ শুধু অতীত দিনের কথা, সে যুগের মানুষের সৃষ্টির আর রূপকল্পনার কথাই স্মরণ করায় না—জানিয়ে দেয় এই দেশের অধিবাসীদের মনের সন্ধান। এই ৩৫০০ মাইল ভ্রমণে বহুলোকের সান্নিধ্য লাভ করেছি, আলাপ আলোচনাও করেছি। মনে পড়ে একটি রাত্রের কথা—ট্রেনে অসম্ভব ভীড়ে ঐ অঞ্চলের ৩।৪ জন যুবককে আমাদের কামরায় পেয়ে তাদের সঙ্গে প্রায় ৪।৫ ঘণ্টা গল্প করতে করতে আমাদের রাত কেটেছিল। সেই সময় লক্ষ্য করেছিলাম তাদের অনুসন্ধিৎসা, কত আগ্রহ করে তারা বাংলাদেশ সম্বন্ধে জানতে ও শুনতে চায়। এই

জানবার ইচ্ছা শুধু বাংলাকেই নয়—পরস্পরকে। আমাদের শিক্ষা, সংস্কৃতির উপযুক্ত হয়ে উঠে এইভাবে দেশে দেশে নিজেদের পরিচয় বহন করে নিয়ে গিয়ে সকলের পক্ষেই দেশমাতৃকার স্নেহস্পর্শ পাওয়ার সুযোগ যদি আমরা করতে পারি, বাঙ্গালী হিসাবে, ভারতীয় হিসাবে সেটা বড় কম কাজ নয়। উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিম যে পরস্পরেরই ভাই—এটা জানাবার বা জানবার সুযোগ দেশভ্রমণই ত' এনে দেয়। স্বামী বিবেকানন্দ যেমন একদিন ভারতের গৌরব অক্ষুন্ন রেখেছিলেন চিকাগো ধর্ম মহাসভায়, বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে তেমনই নানাদেশ ভ্রমণ করে, নানালোকের সঙ্গে মিলিত হবার সুযোগ পেয়ে আমরাও অনেক নিতে ও দিতে পারি—সমস্ত দেশবাসীকে বলতে পারি—

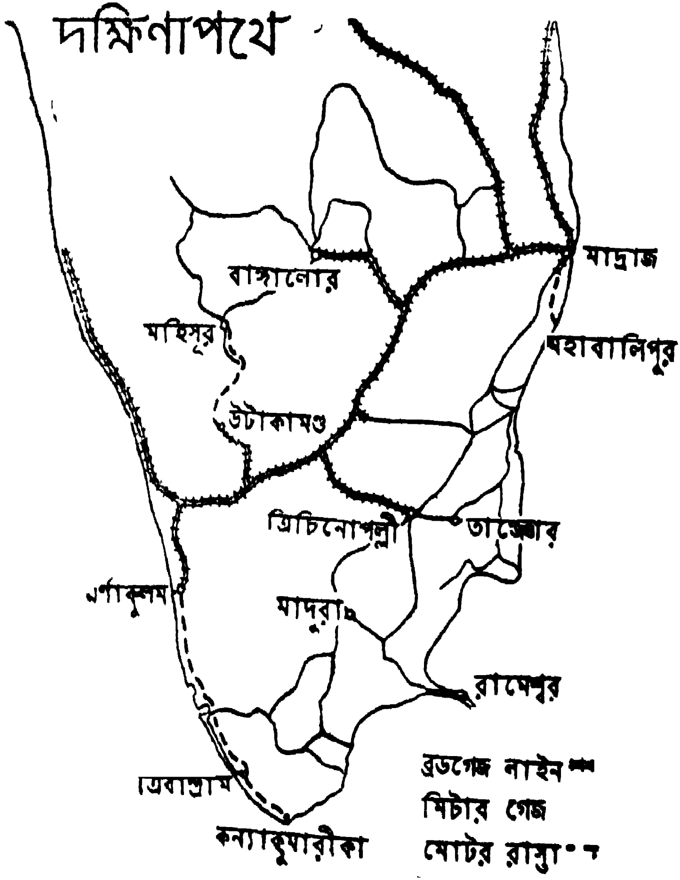
"মার অভিষেকে এস এস ত্বরা,
মঙ্গলঘট হয়নি যে ভরা,
সবার-পরশে পবিত্র-করা
তীর্থনীরে······"।

'দক্ষিণাপথে' মানদাচরণেরই চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের ফল। ইতিহাসের ছাত্রহিসাবে লেখকের এইসব দেখাশোনার যথেষ্ট উৎসাহ ছিল। এছাড়া আমার মনে হয় আরও একটা জিনিষ তাকে এই প্রচেষ্টায় অনুপ্রাণিত করেছিল, সেটা তার কর্ত্তব্যবোধ ও দেশপ্রেম। আমাদের এই পরিক্রমায় সবসময় মানদাকে দেখেছি খাতা পেন্সিল নিয়ে তথ্য সংগ্রহ করতে সে ব্যস্ত। কখনও স্থানীয় লোকেদের সঙ্গে আলোচনা করে, কখনও বা গাইডের কাছ থেকে আবার কখনও বা স্থাপত্যশিল্প, ভাস্কর্য্য ইত্যাদি পরীক্ষা করে সে সব সময়ই চেষ্টা করেছে অতীত ভারতকে জানবার। শুধু জেনেই সে থামেনি, যেটুকু জেনেছে তা সকলের সামনে উপস্থিত করার যে আন্তরিক ইচ্ছা তার ছিল তারই প্রকাশ সে করেছে এই 'দক্ষিণাপথে' লিখে ও প্রকাশিত করে। বাঙ্গালীর কাছে

দাক্ষিণাত্য নতুন নয়, কিন্তু সুদূর। দূর বলেই হয়ত আমরা তাকে দূরেই রেখেছি। মানদাচরণের 'দক্ষিণাপথে' সেই দূরকেই কাছে আনার চেষ্টা মাত্র। তাই এতে শুধু বিশিষ্ট তীর্থস্থানের বর্ণনাই নাই, সেইসঙ্গে আছে আরও কিছু—যা এই মহামানবের মিলনতীর্থ ভারতবর্ষকে চিনতে সাহায্য করে। আজকের দিনে যখন আমাদের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন নিজেকে ও পরস্পরকে জানবার এবং বুঝবার সেই সময়ে নিজের দেশ ও দেশবাসীকে জানাতে ও বুঝতে এভাবে সাহায্য করে সে যে সাধারণের উপকারই করেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। লেখার প্রচেষ্টা মানদাচরণের এই প্রথম হলেও আন্তরিক। ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গী চিত্তস্পর্শী। সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাদের সহানুভূতি যে তাকে উৎসাহিত করবে ও তার এই চেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হবে—এ বিশ্বাস আমার আছে।

নরসিংহ দত্ত কলেজ, হাওড়া। **সতীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়**

৯ই পৌষ, ১৩৬২


দক্ষিণাপথে
মাদ্রাজ
বাঙ্গালোর
মহিসূর
মহাবালিপুর
উটাকামণ্ড
ত্রিচিনোপল্লী
তাঞ্জোর
এর্ণাকুলম
মাদুরা
রামেশ্বর
ত্রিবান্দ্রাম
কন্যাকুমারীকা
ব্রডগেজ লাইন
মিটার গেজ
মোটর রাস্তা

গত দুবছর ধরে দক্ষিণভারত পরিক্রমার কাহিনী বরানগর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সন্তোষ সেবায়তনের প্রকাশিত 'ভাবমুখে' মাসিক পত্রিকায় বেরিয়েছে। যাঁরা এই কাহিনী পড়ে আনন্দ পেয়েছেন তাঁদেরই আন্তরিক সহানুভূতিতে বই এর আকারে এটি প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে। আমার বন্ধু ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের সহযোগিতা ও পরামর্শ না পেলে আমার পক্ষে এই বইখানি প্রকাশ করা সহজ হত না। এই প্রসঙ্গে পণ্ডিতপ্রবর অধ্যাপক শ্রীগৌরীনাথ শাস্ত্রী, সুসাহিত্যিক অধ্যাপক শ্রীকনক বন্দোপাধ্যায়, অধ্যাপক শ্রীসতীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিশ্ববাণী পত্রিকার পূজনীয় স্বামী বেদানন্দ মহারাজ মহোদয়গণের উপদেশ ও উৎসাহ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া অধ্যাপক শ্রীসতীনাথ বন্দোপাধ্যায় মহাশয় আমার অনুরোধে ভূমিকা লিখে ও ভ্রমণের সময় তাঁর তোলা আলোকচিত্রগুলি প্রকাশ করবার অনুমতি দিয়ে আমায় অশেষ ঋণে আবদ্ধ করেছেন। তাঁদের সকলকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

লেখক

মালা আমাদের কণ্ঠে দোলেনি, অভিনন্দনের বাজনা বাজেনি, শুধু শুভার্থীদের শুভাশীষ আর কল্যাণকামনা হয়েছিল চলার পথের পাথেয়। এই প্রসঙ্গে আমার মনে পড়ে যায় আশ্রম থেকে বিদায়ের পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত। ধ্যান জাগ্রত ঠাকুর মন্দির থেকে পুষ্পার্ঘ্য আমার হাতে তুলে দিয়ে আশীর্ব্বাদ করলেন। তাঁর শেষ কথাটী—"পুনরাগমনায় চ……" যাত্রাপথের বহুদূরাবধি আমার কাণে বাজতে থাকে।

দক্ষিণাপথ—বিন্ধ্যপর্ব্বত, পূর্ব্ব ও পশ্চিমঘাট পর্ব্বতমালার মালভূমি। পূর্ব্বে বঙ্গোপসাগর, পশ্চিমে আরবসাগর ও দক্ষিণে ভারত মহাসাগর যুগ যুগান্তর ধরে বয়ে চলেছে। পূর্ব্বে পূর্ব্বঘাট আর পশ্চিমে পশ্চিমঘাট পর্ব্বতমালা নীলগিরি নামে একটী ক্ষুদ্র গ্রন্থিতে মিলিত হয়েছে। একদিকে পাহাড় ঘেরা দাক্ষিণাত্যের কঠিন পাষাণ হৃদয় অন্য দিকে তারই মাঝে মাঝে নর্মদা, মহানদী, গোদাবরী কৃষ্ণা, কাবেরী জলবাহিকা মালভূমির বুকে কোমলতার স্পর্শ এনে শ্যামল শস্যের আঁচলখানি বিছিয়ে দিয়েছে। এই নদী আর সাগরতীর অবলম্বন ক'রে কত মহান সভ্যতা ও শক্তিশালী রাজ্য গড়ে উঠেছে। এদেরই আকাশ, বাতাস আর মাটীর সঙ্গে মিশে আছে কত ভাঙ্গাগড়া, হাসিকান্নার কথা ও কাহিনী। তাই কালের বক্ষে একদা জাগ্রত ও বিধ্বস্ত কত জনপদ ও রাজশক্তি আজ শুধু ঐতিহাসিক যুগের কথা উপকথায় তার কিছু স্মৃতি বহন ক'রে দাঁড়িয়ে আছে।

বিভিন্ন জাতি ও সভ্যতাকে উপলব্ধি করবার পারস্পারিক ঔৎসুক্য মানবীয় মনের চিরন্তন ধারা। এই ধারার প্রবাহই আমাদের এগিয়ে নিয়ে গেছে একটী সভ্যতার পীঠভূমি থেকে অপর একটী সভ্যতার সংস্পর্শে।

১৩ই মে, ইং ১৯৫৩ সাল। নির্দ্দিষ্ট সময়ের কিছু আগে আমাদের দলের সবাইকে হাওড়া ষ্টেশনে ডাকগাড়ীর পাশে উপস্থিত দেখলাম। বিদায়ের সময় যত এগিয়ে আসে, পরিচিত জনের আলাপের গভীরতা তত বেড়ে যায়। অবশেষে ঘণ্টা বেজে ওঠে—আসন্ন বিচ্ছেদের কথা জানিয়ে দেয়। ৪-৪০ মিঃ, মদ্রাস ডাকগাড়ী তার যাত্রা সুরু করল। কি জানি কেন প্রাণের মধ্যে অনুভব করলাম কবি গুরুর সঙ্কল্প বাণী—

আমাদের যাত্রা হল সুরু এখন, ওগো কর্ণধার,
তোমারে করি নমস্কার ॥
এখন বাতাস ছুটুক, তুফান উঠুক ফিরব না গো আর,
তোমারে করি নমস্কার ॥

আজ ফেরবার কথা ভুলে যাই, শুধু যাবার কথা দূরে—বহুদূরে। মনের বাঁধন আজ টুটে গেছে, সেও ছুটছে ঐ ডাকগাড়ীর মত। সঙ্গে সঙ্গে অনেক না জানা, না শোনা কথা ভেসে আসছে। এদিকে দিনের শেষ আলো সন্ধ্যার কোলে মিশে গেল আবার সন্ধ্যা হারিয়ে গেল রাতের বিরাট গভীরতার মাঝে। আমরাই যেন চলমান যাত্রী, আমাদের

চারিপাশে নিবিড় ঘন অন্ধকারের বিশাল গহ্বর ; তাকেই ভেদ করে আমরা চলেছি সেই বাঁশীর ডাকে—

ডাকো ডাকো ডাকো আমারে,
তোমার স্নিগ্ধ শীতল গভীর
পবিত্র আঁধারে।
তুচ্ছ দিনের ক্লান্তি গ্লানি—
দিতেছে জীবন ধূলাতে টানি,
সারাক্ষণের বাক্য মনের—
সহস্র বিকারে।

হঠাৎ কল্পনার সূত্র ছিঁড়ে যায়। ডাকগাড়ীর একটী ছোট্ট কামরায় নানা বিষয়কে অবলম্বন করে চলেছে আলোচনা কিন্তু সবটাই যেন খাপছাড়া, ব্যক্তি বিশেষের চেতন ও অবচেতন মনের বিভিন্নমুখী চিন্তাধারা। এমনি এক পরিবেশে মাঝে মাঝে আমাদের সহযাত্রী একজনের সরসউক্তি বেশ ভাল লাগছিল। তিনিই আমাদের দলের ম্যানেজার 'বিজয়বাবু' ; আমাদের ভালমন্দের সর্ব্বময় কর্ত্তা। ক্ষতি নাই, যদি আসল নাম ভুলে গিয়ে 'রসিকরাজ' নামটী ধরে কখন তাঁকে ডাকি। এই অবসরে দলের অপর কয়েকজনের পরিচয় দিয়ে যাই। সুদীর্ঘ পথ যাত্রায় মনোরম ও দর্শনীয় স্থানের চিত্রগ্রহণের ভার নিয়েছিলেন সতীনাথদা আর তাঁর সঙ্গে ছিলেন জগদানন্দ বাবু ওরফে চাটুয্যে মশাই। কোন কোন সময়ে দেখতাম সনাতন বাবু

তাঁর ছোট্ট ক্যামেরাটী নিয়ে চিত্রশিল্পীর ভূমিকায় নেমেছেন। দীর্ঘ ভ্রমণের কর্ম্মতালিকা তৈরীর কাজে হিমাংশুদা ছিলেন প্রধান আর তাঁর কাজে সহযোগিতা করেন বিশ্বেশ্বরদা ও সতীনাথদা। 'রসিকরাজ' আর সনাতন বাবু উপযুক্ত বিশ্রাম স্থান আর খাদ্যবস্তু নির্ব্বাচনে সদাই ব্যস্ত ছিলেন। আপনভোলা বিমলদা ভারমুক্ত হতে চাইলেও সময় সময় সব ভারই তাঁর কাছে এগিয়ে আসত। এই দীর্ঘ পথযাত্রাকে কথার মধ্যে ধ'রে রাখবার ভার পড়েছিল আমার উপর। মাঝে মাঝে সেই কথার মধ্যে রূপের ইঙ্গিত রেখে যায় সতীনাথদার কথা আর সুর। এইটুকু আমাদের সামান্য পরিচয়। বিভিন্ন রুচিতেভরা আমাদের মন সবাইকে ভিন্ন ক'রে রাখতে পারেনি কারণ আমরা একই পথের যাত্রী, একই নেশায় পাগল। অল্প সময়ের মধ্যে তাই গড়ে ওঠে নিবিড় ঘনিষ্ঠতা। এই ঘনিষ্ঠতার স্মৃতি সহজে মোছবার নয়।

শুধু কথায় পেট ভরে না। আমাদের সকলের সংগৃহীত খাদ্যের সদ্ব্যবহার চলেছে সময় ও অসময়ের বিচার না করে। কোনটা আজ, কোনটা কাল রসনাতৃপ্তির প্রয়োজন মেটাবে সেকথা ভুলে গিয়ে একেবারে যাযাবরি ভাব। সকলেরই কিছু কিছু পরিবেশনের ভার এখানে ছিল। তাই খাদ্যবণ্টনে ফাঁকের সুযোগ সহসা মেলেনি। একাজে চিরপরাধীন আমরা এমন সুবর্ণ সুযোগ বেশ মজার সঙ্গেই উপভোগ করছিলাম।

রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর—ডাকগাড়ী খুর্‌দা রোডে এসে

থামল। ক্ষণিক বিশ্রামের পর লৌহদানব আবার চীৎকার করে আরম্ভ করল তার যাত্রা।

ট্রেনের উদ্দাম গতির সঙ্গে তাল রেখে চলেছে দুটী শিশু কন্যার চঞ্চলতা। নাম তাদের বান্নু ও লাচ্ছু। হায়দ্রাবাদে তাদের বাড়ী। সঙ্গে আছেন তাদের বাবা ও মা। গুরুজনের কড়া শাসন তাদের অশান্ত ভাবকে দমন করতে পারেনি। সঙ্গীহিসেবে আমাদের ২।১ জনকে বেছে নিয়েছিল। ভাঙ্গা ভাঙ্গা হিন্দী আর কখনও ভাব ও ইসারার মাধ্যমে তাদের সঙ্গে আলাপন চলেছে। পরস্পরের ভাষা না বোঝার অক্ষমতাকে তারা হাসির ঢেউ তুলে ভাসিয়ে দিচ্ছিল। তাদের শিশুমনে বিভিন্ন দেশ ও জাতির ব্যবধান নাই, সবাই যেন সেই একই মানব গোষ্ঠীর মধ্যে, সবাই আপন ঘরের লোক। তাই পরিচয়ের ভূমিকা তাদের স্পর্শ না করে' আলাপের নিবিড়তাকে মহান করে' তুলেছিল। আমাদের চশমা, পেনসিল, ফাউনটেনপেন আর ডায়েরী তাদের কখন কখন খেলার সামগ্রী হয়েছে। তাদের স্বচ্ছ হাসির আলো মাঝে মাঝে বিরক্তির ছায়াকে সরিয়ে দিচ্ছিল। যাত্রাপথে নানা স্মৃতির সঙ্গে এদের পরিচয়ের মর্য্যাদা কতটুকু থাকবে জানিনা তবে আমার ছোট্ট ডায়েরীর পাতায় তাদেরই হাতে টানা হিজি বিজি রেখা সহজে উঠবে না।

কখন্ সেই গভীর অন্ধকারের সঙ্গে মৌনতার নিভৃত আলাপন শেষ হ'ল জানিনা। তন্দ্রাচ্ছন্ন রাতের মাঝে কত

গাছ, কত নদী, কত পাহাড়ের সারি ফেলে এলাম দৃষ্টিপথের বাইরে। চলন্ত ডাকগাড়ীর বিশ্রাম মুহূর্ত্তে কখন কখন শুনতে পাই গতানুগতিক কোলাহলের প্রতিধ্বনি। রাত্রির অন্ধকার কেটে গেল, আবির্ভাব হ'ল নবারুণের। ছড়িয়ে পড়ে তার হাসি দিকে দিকে। অন্ধকারের অস্পষ্টতা যেন আপন ঘোমটা সরিয়ে চকিতে ধরা দিল দিনের আলোয়, দক্ষিণাপথের মালভূমির বুকে দেখি পূর্ব্বঘাট পর্ব্বতমালা কোথাও জেগেছে আবার কোথাও ডুবেছে। বিরাট প্রাচীরের মত এই পর্ব্বতমালা যেন আভ্যন্তরীণ ঐশ্বর্য্যকে আড়াল ক'রে আছে। পথের ধারে কেয়াবনের সারি। ভোরের স্নিগ্ধ হাওয়ায় কেয়াফুল থেকে ভেসে আসা মনমাতান গন্ধ দীর্ঘ পথ যাত্রার ক্লান্তিকে ভুলিয়ে দিচ্ছে। প্রান্তরের পর প্রান্তর আম আর তাল গাছ সারি সারি দাঁড়িয়ে আছে। মনে পড়ে যায় উত্তরাপথে উজ্জয়িনীর সভাকবির বর্ণনা—

দূরাদয়শ্চক্রনিভস্য তন্বী, তমালতালী বনরাজিনীলা।
আভাতিবেলা লবণাম্বুরাশের্ধারানিবদ্ধেব কলঙ্করেখা॥

যাত্রা পথে জানকীর কাছে শ্রীরামচন্দ্রের এই পথ বর্ণনা আজও মহাকবির কাব্যের ছন্দে অমর হয়ে আছে। কখনও বা দেখি প্রকৃতি দেবী নানা তরুলতায়, নানা ফলফুলে আপন খেয়ালে আপন শোভায় সেজে রয়েছেন। সযত্ন বিন্যাসে গড়ে ওঠে সখের বাগান। সেখানে মালিক থাকে অতি নিকটে, সকলের সামনে আর এ প্রকৃতির কানন শোভা

আপন খুসীতে ভ'রে ওঠে লোক চক্ষুর অন্তরালে। এখানের মালিক রয়েছেন সবার অলক্ষে চিররহস্যের মাঝখানে। কোথাও জলহীন বালুকাময় নদী শুষ্কতার গ্লানি নিয়ে নীরব হয়ে আছে। মাঝে মাঝে আম, তাল ও নানা জাতীয় গাছের ফাঁকে ফাঁকে তাল পাতায় মোড়া ছোট ছোট কুঁড়ে ঘরগুলি দেখা যাচ্ছে। ঐ ঘরের মধ্যে যুগ যুগ ধরে কত নূতন, কত পুরাতন মানুষ বাস করে চলেছে। ওদেরই মাটি, ওদেরই ফলান ফসল তবুও ওদের কিছু নাই, তবুও ওরা মানুষ নয়। মনে পড়ে যায় পাশ্চাত্য কবির কথা—

"Full many a gem, of purest ray serene,
The dark unfathomed caves of ocean bear,
Full many a flower is born to blush unseen,
And waste its sweetness on the desert air."

দেখতে দেখতে ভিজিয়েনাগ্রাম এসে গেল। গ্রীষ্মের রুক্ষতাকে পিছনে রেখে পাহাড় ঘেরা মাটীর পরে' শ্যামল শোভা ভেসে ওঠে। বেলা গড়িয়ে চলেছে। চাই বিশ্রাম, যাত্রী আর যাত্রীবাহকের। অন্যতম বিশ্রামস্থান ওয়ালটেয়ারে ডাকগাড়ী অনেকক্ষণ অপেক্ষা করল' আপন প্রয়োজনে আর যাত্রীদের প্রয়োজনে। সেই অবসরে স্নানাদি সেরে আমরা দক্ষিণ হস্তের পর্ব্ব শেষ করলাম। আরম্ভ হ'ল দক্ষিণ ভারতীয় ভোজ্যের মহিমা—'রসম', 'সম্বরম' আর সর্ব্বভূতেষু 'কারি' পাতা। ক্ষতি কি, স্বাদের

নূতনত্ব লাভ ত হল? ওয়ালটেয়ার থেকে ডাকগাড়ী দক্ষিণাপথে ক্রমশঃ নেমে আসছে। কাঁকর ভরা লাল মাটির পথ অনেকক্ষণ অতিক্রম ক'রেছি। প্রচণ্ড গ্রীষ্মে এগিয়ে চলেছি বালিভরা মাটির ওপর দিয়ে। রাজামন্ত্রী পিছনে ফেলে এলাম। প্রাচীন স্মৃতিভারে পূত গোদাবরী নদী ক্রমশঃ চোখের সামনে এগিয়ে এল। ডাকগাড়ী চলেছে তারই বুকের ওপর দিয়ে। দুইপাশে জেগে ওঠা বালুচর— অগভীর জলের সাক্ষ্য দিচ্ছে—শান্ত, নীরব মূর্ত্তি, যেন অতীতের মহান স্মৃতিস্পন্দন অন্তে আজ স্তব্ধ হয়ে আছে। মৃগয়া প্রত্যাবৃত্ত শ্রীরামচন্দ্রের কোমল কান্তির স্পর্শ বিহনে গোদাবরী তরঙ্গোচ্ছ্বাস বুঝি আজ থেমে গেছে। পঞ্চবটীর মাঝে জনশূন্য বেতস গৃহ আজ কোথায়? এক দিন এই নিরালা বেতস গৃহেই সীতার অঙ্কে শায়িত শ্রীরামচন্দ্রের সকল ক্লান্তির অবসান হয়েছে। এই গোদাবরী দৃষ্টিপথে এলে প্রত্যেক হিন্দুকেই মহাকাব্যযুগের এক করুণ অধ্যায়ের মাঝে নিয়ে যায়। শুধু চোখের দেখায় শেষ হ'ল না। সতীনাথদা আর চাটুয্যে মশাই চলন্ত ডাকগাড়ী থেকে পূত সলিলা গোদাবরীর দৃশ্যকে নিজ নিজ ক্যামেরায় ভ'রে নিলেন। মনের সঙ্গে ছবির ঘরে গোদাবরীর স্মৃতি ধরা রইল। গোদাবরীর অপর পাশে Kavvar। এই স্থানের কতকগুলি আধুনিক রুচিসম্মত অট্টালিকা—বর্ত্তমান ও প্রাচীনের ব্যবধানকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। গোদাবরীর

তীর আজ তরঙ্গোচ্ছ্বাসের পরিবর্ত্তে জন কোলাহলে ভরে উঠেছে।

সন্ধ্যার পরে রাত্রি নেমে এল। Ellore, Powerpet, Bezwada অতিক্রম করলাম। পিপাসার্ত্ত ডাকগাড়ী বেজ্‌ওয়াদায় আকণ্ঠ জলপান ক'রে নূতন উদ্যমে ছুটে চলল অন্ধকারের পথে। দক্ষিণাপথের প্রসিদ্ধা কৃষ্ণানদী অন্ধকারের আবরণে নিঃশব্দে চলে গেল দৃষ্টিপথের বাইরে। রাত্রি ক্রমশঃ গভীর হয়। যাত্রীদের ওঠা নামার বিরাম নাই। কখন নিদ্রা, কখন জাগরণে রাত্রির পরপারে ভেসে চলেছি। ভোরের স্নিগ্ধ বাতাস জাগরণের ক্লান্তি দূর করে দেয়। আকাশে শুকতারা তখনও জ্বল্ জ্বল্ করছে। উন্মুখ হয়ে রয়েছে পৃথিবী প্রভাতরবির আবাহন উদ্দেশ্যে। দিকে দিকে তারই আয়োজন চলেছে। সালারপেট ছেড়ে ডাকগাড়ী ছুটে চলল তার লক্ষ্যস্থলে। মদ্রাস প্রায় ৬০ মাইল পথ। কোথাও বিরাম নাই। ভোরের বাতাস, পথের শেষ যেন উৎসাহিত করেছিল এই বিরাট লৌহদানবকে। সমস্ত ক্লান্তি থেকে সে যেন মুক্তি পেয়েছে। নূতনকে দেখার আশায় যাত্রী আমরা কম উৎসাহিত হইনি। কোথায় বাংলার শ্যামল শোভা আর হরিৎক্ষেত্র—দুপাশে যতদূর দেখি, বালি আর ধূলা। মাথায় ধূলা, ট্রেণে ধূলা, জামা-কাপড়ে ধূলা, সর্ব্বাঙ্গ ধূলামলিন। প্রথম দর্শনেই মদ্রাসের যে গৈরিকরূপ চোখে পড়ল তা থেকে বুঝলাম

এদেশের আরাধ্য দেবতা নটরাজ কেন? মনে হল সার্থক কবিগুরুর নটরাজের রূপ কল্পনা—অনুভব করলাম রুদ্র সন্ন্যাসীর রুক্ষতাকে।

ডাকগাড়ী এগিয়ে চলে—ক্রমশঃ চোখে পড়ল মাটির ওপর সংগৃহীত লবণসারের স্তূপ। বুঝলাম এদের কৃষি প্রচেষ্টা কত আন্তরিক। এই শুষ্কতার মধ্যেও ফসল ফলাতে এরা কতটা তৎপর। এদিকে ঘন বনের ফাঁকে ফাঁকে উদিতপ্রায় সূর্য্যের রক্তিমাভা কখন কখন উঁকি দিয়ে যায়। অদূরে দেখা যায় সাগরের বিশাল জলরাশি—অনন্তের সঙ্গে অন্তর ও দৃষ্টির প্রথম ভাব বিনিময়। হারিয়ে যায় জীবনের তুচ্ছতা, বাস্তবের স্থূলতা; শিশুর প্রথম মাতৃ সম্বোধনের আনন্দময় অনুভূতির মতই জীবনে প্রথম এই বিরাট রূপদর্শনের অনুভূতি। ভাষার শব্দ ও ধ্বনি যেন এখানে নীরব হয়ে যায়। সর্ব্বব্যাপী নারায়ণের স্বরূপ কীর্ত্তনের মত মহাসাগরের রূপ বর্ণনা সম্ভবপর নয়। অনন্তের মাঝে অনন্তজ্যোতিঃ ফুটে উঠল। সাগরের জলরাশি আকর্ষণ ক'রে যেন সূর্যদেবের রশ্মিজাল ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে। মনপ্রাণ বিভোর করে দেয় এই অপরূপ দর্শনের মহিমায়। মন্দ্রাস সহর আর বেশী দূরে নয়।

নারিকেল বৃক্ষভরা বনের পাশ দিয়ে এগিয়ে চলে ডাকগাড়ী। প্রসিদ্ধ Asoke Motors এর কারখানা, Basin Bridge অতিক্রম করলাম। ঐ দেখা যায়—

Madras Central Station—সফল যাত্রার শেষে আনন্দময় গতি নিয়ে ডাকগাড়ী প্রবেশ করবে তার লক্ষ্যস্থলে।

প্রায় হাজার মাইল পথ শেষ হ'ল। কলকাতা থেকে মন্দ্রাস ডাকগাড়ী যাত্রাক্লান্ত যাত্রী নিয়ে ধীরে ধীরে Madras Central Stationএ প্রবেশ করল। ডাকগাড়ীর কামরা থেকে নেমেই দেখি সতীনাথদার পরিচিত পাঞ্জাবী ভদ্রলোক নন্দ্‌কিশোরজী হাসিমুখে স্বাগত সম্ভাষণ জানাবার জন্যে আমাদের দিকে এগিয়ে আস্‌ছেন। অপরিচিতের মাঝখানে কোন এক পরিচিতজনের এই আহ্বান বড় মধুর, বড় আনন্দদায়ক। তাঁরই ব্যবস্থানুযায়ী মোটরযানে আমরা নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান Rayapuramএর দিকে অগ্রসর হলাম। যাবার পথে South Indian Rlyএর Headquarter, High Court, General Post Office, কতকগুলি Bankএর বড় বড় অট্টালিকা চোখে পড়ল। পথের ধারে দেখি বৈদ্যুতিক ট্রেন ছোটাছুটি করছে—কর্ম্মব্যস্ত সহরের বৈশিষ্ট্য। Parry's Corner অতিক্রম করে নির্দ্দিষ্ট বাসস্থানের কিছু আগেই দেখা গেল সমুদ্রের বিশাল নীলিমা সূর্য্যকিরণস্পর্শে চিক্ চিক্ করে উঠছে। তরঙ্গের পর তরঙ্গের গর্জ্জন তীরবর্ত্তী স্থান সমূহকে সদাই শব্দময় করে রেখেছে। এইভাবে সমুদ্রের তরঙ্গগর্জ্জনের মধ্য দিয়েই Rayapuramএর বাসায় পৌছলাম। এই স্থানটী Anglo Indianদের বাসস্থান ব'লে এর স্বাভাবিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সহজেই সকলের

দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সৌভাগ্যক্রমে নন্দ্‌কিশোরজী গৃহটীর দ্বিতল অংশে আমাদের বিশ্রামের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। কোন ব্যবস্থার ত্রুটি ছিল না। পানীয় জল, স্নানের জল, এমন কি অবসর বিনোদনের জন্য একটী গ্রামাফোন যন্ত্র Drawing Room-এর একপাশে সাজান রয়েছে। এই সঙ্গে আমাদের প্রয়োজনাদির অভাব মেটাবার জন্য একজন স্থানীয় ব্যক্তি সকল সময়ে নিযুক্ত ছিল। বাসায় পদার্পণের কিছু পরেই তিনি চা ও জল খাবারের ব্যবস্থা করে দিলেন। দীর্ঘ পথযাত্রা শেষে গৃহাশ্রয়ের তৃপ্তিকে আমরা বেশ নিবিড়ভাবেই উপভোগ ক'রছিলাম। নিকটেই সমুদ্র। তার জ'লো শীতল হাওয়া আমাদের দৈহিক ক্লান্তিকে ভুলিয়ে দিচ্ছিল। এই অবসরে নন্দ্‌কিশোরজী দক্ষিণাপথ পরিক্রমার আগে আমাদের কর্ম্মসূচী সম্বন্ধে তাঁর-সুচিন্তিত মতামত প্রকাশ করছিলেন। ঘড়ির কাঁটার তালে তালে আমাদের চলতে হবে, এতটুকু এদিক ওদিক হবার উপায় নাই। সকলের স্নানাদি শেষ হ'লে নন্দ্‌কিশোরজীর সঙ্গে আমরা স্থানীয় একটী প্রসিদ্ধ হোটেলে মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য উপস্থিত হ'লাম। সেদিনকার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত মদ্রাসী খাদ্যের বিশেষ বিশেষ আহার্য্যবস্তুগুলি আমাদের জন্য পরিবেশনের ব্যবস্থা হ'ল। হোটেলের একটী স্থানে আমাদের একধারে বসান হ'ল। ভাতের পরই 'রসম্' 'সম্বরম্' আর কারিপাতা

সহযোগে আরও কয়েকটা নাম না জানা খাদ্যবস্তু একের পর এক পড়ে গেল। আমাদের সামনেই দাঁড়িয়ে আছেন নন্দ্‌কিশোরজী আর হোটেলের মালিক। সর্ব্বশেষে ঐ দেশীয় ২।১টা মেঠাই আর তায়ের (দধি) দিয়ে আমাদের পরিবেশন শেষ হ'ল। পরদেশী খাদ্য হলেও ভোজনের তৃপ্তিলাভে সেদিন কারই বঞ্চিত হবার অবকাশ ছিল না।

আহার শেষে নন্দ্‌কিশোরজী আমাদের সকলকে তাঁর ছায়াশীতল বাংলোতে নিয়ে গেলেন। হাসিমুখে তাঁর স্ত্রী আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন। কিছু পরেই দেখি তিনি পুত্র ও কন্যার সাহায্যে আম ও পেঁপের থালা সাজিয়ে এনে আমাদের সদ্ব্যবহারের জন্য অনুরোধ জানাচ্ছেন। আকণ্ঠ ভোজনের পর অতিরিক্ত কিছু গ্রহণের অনিচ্ছা সত্ত্বেও অতিথিপরায়না গৃহকর্ত্রীর একান্ত অনুরোধকে আমরা সহজে উপেক্ষা করতে পারলাম না। ওদিকে নন্দ্‌কিশোরজী তখনও অভুক্ত রয়েছেন। বেলা প্রায় ২টা বেজে গেছে। আগে অতিথির সেবাই বড় সেবা সেখানে নিজের সেবা এমন কিছু নয়। দুপুরের সেই প্রচণ্ড রোদ মাথায় নিয়ে নন্দ্‌কিশোরজী সকাল থেকেই আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছেন পাছে অপরিচিত স্থানে আমরা কোন অসুবিধায় পড়ি। আতিথেয়তা ও কর্ত্তব্য জ্ঞানের অনেক বড় বড় কথা ও গল্প আছে এবং শোনাও যায় কিন্তু তার বড় নিদর্শন আজ নিজেদের চোখে দেখা গেল। কোমলপ্রাণ ও ভাবপ্রবণ

বাঙ্গালীর চোখে এই মহানুভবতা ও স্বার্থশূন্যতা সহজে এড়ায় না। তাই ব্যস্ত হয়ে আমরা তাঁকে আহারে বসিয়ে উঠে আসছি কিন্তু তাতেও তাঁর চিন্তার অন্ত নাই। তিনি তাঁর ৯।১০ বৎসরের পুত্র প্রদীপকে আমদের সঙ্গে দিলেন বাসে তুলে দেবার জন্য পাছে আমরা ভুল পথে চলে যাই। মুগ্ধ করে তাঁর কর্ত্তব্যবোধ। আজ আমরা দক্ষিণভারতে এসে সকলরকম সুবিধার ব্যবস্থা পাচ্ছি একজন উত্তরাপথের অধিবাসীর কাছ থেকে। মনে হচ্ছিল, দক্ষিণভারতের সমস্ত ত্রুটি আড়াল করে তার এক পরদেশী বন্ধু সহযোগিতা করতে দাঁড়িয়ে আছেন। দক্ষিণ ভারতের মন্দির ও দর্শনীয় স্থানগুলির মত নন্দ্‌কিশোরজীর কথা সহজে ভোলবার নয়। ইংরাজী ভাষায় Thank you আর বাংলায় ধন্যবাদ দিয়েই নন্দ্‌কিশোরজীর উদারতা ও আতিথেয়তাকে ছোট করতে চাই না। তাঁর প্রতি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও শ্রদ্ধা নিবেদন ভিন্ন অন্য কিছু সম্বল আমাদের নাই। কারণ আতিথেয়তার মূল্য ধন্যবাদে নয়, আতিথেয়তার মূল্য আন্তরিকতায়।

ভরাহ্‌পুরে প্রবাসী বন্ধু নন্দ্‌কিশোরজীর কথা ভাবতে ভাবতে আমরা Rayapuram এর বাড়ীতে ফিরে এলাম। দু-ঘণ্টা বিশ্রামলাভের পর দেখি নন্দ্‌কিশোরজী তাঁর কথামত নির্দ্দিষ্ট সময়ে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। এবার তিনি আমাদের সঙ্গে করে মদ্রাস্‌ সহরের কয়েকটী অংশ

দেখিয়ে আনবেন। আমরা বাসে করে Beachএর কাছে নামলাম। মনের, দেহের সবক্লান্তি দূর করতে পারে সাগর পারের এই মনোরম ও পরিচ্ছন্ন স্থানটী। তাই বেলা শেষে সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে সহরের বিভিন্ন অংশ থেকে নানাজনের সমাবেশ হয় এখানে। প্রথমে আমরা সমুদ্রতীর সংলগ্ন Marina Restaurantএ চা পানের উদ্দেশ্যে প্রবেশ করলাম। প্রবেশ পথের এক পাশে রয়েছে আধুনিক কায়দায় নির্ম্মিত একটী সুন্দর Swimming Pool। Corporationএর নির্ম্মিত এই Swimming Poolটী সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। Restaurantএর অপর একটী পাশে Free Reading এর জন্য একটী Library রয়েছে। উন্মুক্ত ও নির্ম্মল পরিবেশে কর্তৃপক্ষের এইসব ব্যবস্থা সত্যই প্রশংসার যোগ্য। আমরা Restaurant এর উপরতলায় গিয়ে বসলাম। বহুদূরাবধি বালুকাতীর সংলগ্ন সমুদ্রের বিশাল জলরাশি একসঙ্গে চোখে পড়ল। সেই বালুকারাশির ওপর অসংখ্য নরনারী স্থানে স্থানে বসে আছে নানাধরণের পোষাকে। দূর থেকে মনে হয় যেন নানা রঙএর গোছা গোছা ফুল বালির উপর ফুটে রয়েছে। সমুদ্রের জ'লো হাওয়া মধ্যাহ্নের উত্তাপকে ক্রমশঃ সরিয়ে দিচ্ছে। চা পানের পর এ স্থানের কয়েকটী ছবি তোলা হ'ল। তারপর আমরা বালুকাময় তীরের ওপর নেমে পড়ি। সমুদ্রের দিকে এগিয়ে যেতে গিয়ে বালির মধ্যে পা ডুবে যাচ্ছে, তবুও ভাল লাগছে। সমুদ্রের

তরঙ্গ গর্জ্জনের সঙ্গীত যেন আমাদের ডাক দিয়ে বলছে, 'ওরে তোরা আয়, আমার কাছে নেমে আয়।' এগিয়ে যাই তীরের দিকে—নীরব হ'য়ে যায় আমাদের মন ও দৃষ্টির চঞ্চলতা। ফেনায় ভরা ঢেউ একটীর পর একটী আসছে আবার ফিরে যাচ্ছে তার ব্যাকুলতার স্পর্শ রেখে। এই আসা যাওয়ার যেন বিরাম নাই। অসীমের এই বিরামহীন খেলা কে বুঝবে? সেই অনন্ত জলরাশির তীরে দাঁড়িয়ে মানুষের স্পর্দ্ধা, অহমিকা যেন কোথায় হারিয়ে যায়, লুপ্ত হয় আমার আমিত্ব। মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকি বিশ্বপ্রকৃতির সেই সজীব মূর্ত্তির দিকে। বিক্ষিপ্ত, উদ্বেলিত তরঙ্গরাশির বুকের উপর কখন কখন ঝাঁপিয়ে পড়ছে ছেলের দল খেলার সাথীর মত,—অসীমের সাথে যেন সসীমের কোলাকুলি। সন্ধ্যা প্রায় শেষ হয়ে এল। নীরবে সমুদ্রতীর থেকে অসীমের অনুভূতি নিয়ে ফিরে আসছি। মনের মধ্যে জাগছে নানা প্রশ্ন কিন্তু কে তার উত্তর দেবে? হয়ত একদা ভাষা ও প্রশ্নের অতীত এই তীরে দাঁড়িয়েই আমাদের বিশ্বকবির অন্তরে জেগেছিল—

হে সমুদ্র, চিরকাল কী তোমার ভাষা।
সমুদ্র কহিল, মোর অনন্ত জিজ্ঞাসা॥

চিন্তার রাজ্য ছেড়ে নেমে আসতে হ'ল বাস্তবের রাজপথে। বাসে করে মদ্রাস সহরের কয়েকটী বিশিষ্ট পথ

ঘুরে এলাম। হাইকোর্টের উপর Light House এ আলো তখন জ্বলছে।

সহরের মধ্যে অনেকস্থানে এখনও বৈদেশিক শাসনের চিহ্ন রয়েছে। তারই মধ্যে কতকগুলি জায়গা আজ জাতীয় সরকার নিজের কাজে লাগিয়েছে। সহরটী ক্রমশঃ উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে। মদ্রাসের সমুদ্রতীর মনে রাখার মত।

রাত প্রায় ৯টা; আমরা সকলে Broadway Station থেকে বৈদ্যুতিক ট্রেনে Egmore এসে পৌঁছলাম। দেখলাম Sencottah Passenger দাঁড়িয়ে আছে। এবার আমাদের গন্তব্যস্থান চিদ্‌ম্বরম্‌-নটরাজের দেশ। তখনও আমাদের সঙ্গে আছেন নন্দকিশোরজী। গাড়ীতে আমাদের সকলের সুবিধাজনক ব্যবস্থা হয়েছে দেখে তিনি বিদায় নিয়ে সহরে ফিরে গেলেন। কথা রইল দাক্ষিণাত্যের যাত্রা শেষ করে আবার তাঁরই শরণাপন্ন হব। পথের সাথী হিসাবে আমরা এই গাড়ীতে স্থানীয় কয়েকজন ছাত্রকে পেলাম। আমাদের যাত্রার উদ্দেশ্য ও যাত্রীবৃন্দের সংক্ষিপ্ত পরিচয় পেয়ে তাঁরা সকলেই বেশ উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। আমার ঠিক অপর পাশেই সতীনাথদা ন্যায়, অন্যায়, নেতৃত্ব, মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়—এমন কয়েকটী বিষয়কে অবলম্বন করে আলোচনা সুরু করে দিয়েছেন। দুঃখের বিষয় তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় সেই আলোচনার ২।১টি কথা মাঝে মাঝে কানে আসছিল। ছাত্রবন্ধুগণ বিশেষ গুরুত্ব নিয়ে সেই

আলোচনায় যোগদান করেছেন। এইখানে ত' শিক্ষা ও সংস্কৃতিরই সবচেয়ে বড় সাফল্য। অল্প সময়ের মধ্যে মনের দিক থেকে পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করেছে। উত্তর দক্ষিণ অথবা পূর্ব্ব পশ্চিমের ভাষা ও রুচি বৈষম্যের স্থান হয়নি। তাই অল্প-সময়ের মধ্যে আমাদের শয়ন, ভোজন আমাদের সুবিধা ও অসুবিধায় তাঁরা বেশ বিচলিত হয়ে পড়লেন। এদিকে যাত্রীদের ভিড় ও তাদের ওঠানামায় নিঃস্তব্ধ রাত্রিকে মাঝে মাঝে কোলাহলময় করে তুলছিল। ইতিমধ্যে আমাদের গাড়ীর মধ্যে বেশ একটা ঘটনা ঘটে গেল, কিন্তু বুঝলাম অনেক পরে যখন ঘুমটা ভেঙ্গে গেছে। ওদিকে তন্দ্রাচ্ছন্ন বিমলদার তন্দ্রাও হঠাৎ টুটে যায়।

গভীর রাতের প্রায় শেষ সীমায় আমরা চিদম্বরম্ Stationএ পৌঁছলাম। অল্প সময়ের জন্য গাড়ী এখানে অপেক্ষা করে। আমাদের সেই ছাত্রবন্ধুগণ জিনিষপত্তর নামানর বিষয়ে বিশেষ ভাবে সাহায্য করেন। সবই ঠিকমত নেমে গেল, নামলনা শুধু আমার জুতাজোড়ার একটী। সেটী এমনভাবে আত্মগোপন করল যার সন্ধানে সকলকেই বেশ বিব্রত ক'রে তুলল। ছাত্রবন্ধুগণ তন্ন তন্ন করে গাড়ীর মধ্যে অনুসন্ধান করতে লাগল কিন্তু সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে গেল। আমার ত' ঐ এক জোড়াই সম্বল। একটী গেছে আর একটী তখনও অভাগার চরণে। অদৃষ্টের কি পরিহাস? নগ্নপদেই কি আমার ভ্রমণপর্ব্ব শেষ করতে

হবে ? এমনি এক বিভ্রান্ত মুহূর্ত্তে কে একজন জলের পাত্রের Standটী তুলে নিতে গিয়ে দেখেন, সেই Stand এর তলায় হারিয়ে যাওয়া জুতাটী নিঃশব্দে আটকে আছে, উচ্চ হাসির মধ্যে পাদুকা বিভ্রাটের পর্ব্ব শেষ হ'ল। সময় অল্প, পথের সাথীদের নিয়ে গাড়ী এখনই তার চলার পথে এগিয়ে যাবে। বন্ধুদের কয়েকজনের চোখের কোণ জলের ভারে চিক্ চিক্ করে উঠেছে। মনে হ'ল গাড়ীর আলাপন সবসময়ে গাড়ীতেই শেষ নয়, মানুষের অন্তরে সেই ক্ষণিক আলাপনও কত গভীর। তাইত দূর নিকটে, অচেনা চেনায় পরিণত হয় সত্যই—

কত অজানারে জানাইলে তুমি কতঘরে দিলে ঠাঁই
দূরকে করিলে নিকট বন্ধু, পরকে করিলে ভাই।

নিমেষের মধ্যে আমাদের পথের সাথীদের নিয়ে ট্রেনটী চলে গেল। নিশুতিরাতে চিদম্বরম Stationএর ওপর দাঁড়িয়ে আমবা চেয়ে রইলুম বিদায়মলিন মুখগুলির দিকে। আমাদের সামনে তখন স্তূপাকার জিনিষপত্তর আর জন-কয়েক যাত্রী। এই Stationএর প্রায় শেষ প্রান্তে একটী গাছের তলায় আমাদের বিশ্রাম স্থল নির্দ্দিষ্ট হল। রাত্রির অন্ধকারে চিদম্বরমের স্বরূপ সহজে উপলব্ধি করা গেল না। রজনীর প্রায় শেষদণ্ডে আমরা নটরাজের দেশে মুক্ত আকাশের তলায় বসে আছি। অদূরে নামের ফলকে কাল কাল অক্ষরে Statonএর নামটী স্বল্পালোকে স্পষ্ট হয়ে

আছে। কিছু দূরেই দেখা যায় এন্নামেলাই বিশ্ববিদ্যালয়ের আলো, অন্ধকারের কোলে যেন আশার প্রদীপটী জেগে আছে। ভোরের আকাশে তখন উষার আলো সবে জেগে উঠেছে।

চিদম্বরম্ ও তাঞ্জোর

ক্রমশঃ ভোর হল ; ঘুমন্ত চিদম্বরম্ জাগল। অদূরে দেখা যায় নটরাজ মন্দিরের গোপুরমের শীর্ষভাগ। ঠিক হ'ল, প্রাতঃকালীন স্নানাদি সেরে আমরা মন্দির ও বিগ্রহ দর্শনে যাব। খোঁজ করে জানা গেল নদী খুব নিকটেই। প্রায় মাইল খানেক ধানক্ষেতের পথ অতিক্রম ক'রে আমরা যে জলাশয়ের কাছে এলাম তাকে নদী না নালা ব'লব সেটা হঠাৎ ঠিক করতে পারিনি। যাই হোক প্রায় মরুভূমির বুকে সেই সামান্য জলবাহিকাকে মন্দাকিনী অথবা কাবেরী মনে করে স্নানের তৃপ্তি সাধন করতে আমরা কেউ দ্বিধা বোধ করিনি। পথের মাঝে মধ্যাহ্ন ভোজনের ব্যবস্থা ক'রতে গিয়ে বেশ বিভ্রাটে পড়তে হ'ল। কারণ ভোজনাগারের মালিক শুদ্ধ তেলেগু ভিন্ন অন্য কোন ভাষা বোঝেন না। আকার, ইঙ্গিত, ভাব ও সদ্য জানা ভাঙ্গা ভাঙ্গা দক্ষিণী ভাষার মাধ্যমে আমাদের খাওয়ার ব্যবস্থা কোনরকমে শেষ করতে হ'ল।

দক্ষিণ ভারতে এই প্রথম আমরা মন্দির ও বিগ্রহ দর্শনে চলেছি। মনের মধ্যে রয়েছে নানা আশা ও কল্পনার ইঙ্গিত।

পৌরাণিক যুগের দেবদেবীর মূর্ত্তি খোদিত গোপুরমের সম্মুখে উপস্থিত হ'লাম। বিস্ময়ে আমরা চেয়ে আছি সেই ঐতিহাসিক যুগের স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শনের দিকে। যুগের পর যুগ চলে যায় কিন্তু সেই চলে যাওয়া যুগের মানুষের কীর্ত্তি পড়ে থাকে ঐতিহাসিক মর্য্যাদা নিয়ে। আজ যাদের সবাই ভুলেছে, এরা তাদের জাগিয়ে তোলে বর্ত্তমানের বুকে—বাঁচিয়ে রাখে কত বিস্মৃত নীরব কাহিনীকে এরা মহাকালের ধ্বংস তাণ্ডব থেকে। পার্ব্বতী, বিষ্ণু, গণেশ প্রভৃতি দেবদেবীর মূর্ত্তির মাঝে মাঝে নট-রাজের নৃত্য ভঙ্গিমা সমন্বিত বহির্দ্বারের এই গোপুরম্‌গুলি মন্দিরের ভিতর ও বাহিরকে যেন গাম্ভীর্য্য ও ছন্দ দিয়ে ঘিরে রেখেছে। গোপুরম্‌ অতিক্রম ক'রে সামনেই দেখি সিদ্ধিদাতা গণেশের মূর্ত্তি, তারই পশ্চাতে পাথরের শায়িত বিশাল বৃষ। অপর এক পাশে বিরাটকায় গণেশের মন্দির (দক্ষিণ ভারতের বৃহত্তম গণপতি মূর্ত্তি)। এই মন্দিরের গঠন ও শিল্পনৈপুণ্য দেখলেই মনে হয় অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের। দিকে দিকে গোপুরম আর বিশাল প্রাচীরের পরিধি মন্দিরটীকে যেন বাইরের লোকালয় থেকে পৃথক করে রেখেছে। একদিকের গোপুরমের সঙ্গে অনেকগুলি প্রকোষ্ঠ ও ছোট ছোট মন্দির ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। তার কিছু কিছু আজ সংস্কারের চেষ্টা চলেছে। উঁচু খিলান যুক্ত ও নানা কারুকার্য্য সমন্বিত মন্দিরের অভ্যন্তর ভাগ,

সেখানে সাজান রয়েছে বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্ত্তি নানা ভঙ্গিমায়। সাধারণতঃ কোন উৎসবের সময় এই সব মূর্ত্তি শোভাযাত্রা করে নগর প্রদক্ষিণ করে। পুরাতন দিনের ঝাড়লণ্ঠনগুলি আজও ঝুলে আছে অতীতের জাঁকজমকের স্মৃতি নিয়ে। শোনা গেল এই মূল্যবান আলোগুলি এককালে বিদেশ থেকে আমদানী করা হয়েছিল। অভিষেকের বাজনা বেজে ওঠে। সিঙ্গা ও ঢোলের বাদ্যধ্বনি নীরব মন্দিরকে সহসা মুখরিত ক'রে তোলে। একজন ধুনাধার নিয়ে সারা মন্দির প্রদক্ষিণ ক'রছে। গুগ্‌গুলের গন্ধে চারিদিক ভরে উঠেছে। বিরাট মন্দিরের অভ্যন্তরে রাজসভা, দেবসভা, নৃত্যসভা, চিদ্‌সভা, কনকসভা প্রভৃতির মণ্ডপগু'ল আজ জনশূন্য, স্তব্ধ গাম্ভীর্য্যের মধ্যে বিরাজ করছে। প্রধান মন্দিরের সম্মুখে শিবস্তম্ভ। একধারে আছে মহাদেবের আকাশমূর্ত্তি, অপরধারে নটরাজের (মহাদেবের) স্বর্ণমূর্ত্তি।

শিল্পদক্ষতা ও ভাবগভীরতায় অসুরের বুকে দণ্ডায়মান মহাদেবের এই নৃত্যময় ভঙ্গিমা অপূর্ব্ব—পশুশক্তির ঊর্দ্ধে দেবশক্তির অন্তরালে সমগ্র জাগতিক জীবনের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের ইঙ্গিত রয়েছে। ঊর্দ্ধে নিবদ্ধ একটী হাতে অভয় মুদ্রা, অপর হাত গজশুণ্ডের আকারে ঊর্দ্ধে উত্তোলিত বাম পদে নিবদ্ধ ভাব—মনুষ্যত্বের মুক্তির প্রতীক। তৃতীয়-হাতে অগ্নিগোলক নিত্য নূতন সৃষ্টির প্রতীক, চতুর্থ-হাতে ডমরু যার বাদ্যধ্বনির তালে তালে সমগ্র সৃষ্টি ঘোরে যুগ হ'তে

যুগান্তরে। মাথার জটাজাল থেকে বেরিয়েছে সাতটী নদীর ধারা, এদের মধ্যে গঙ্গা অন্যতমা। একটী নয়নে সূর্য্য, অপর নয়নে চন্দ্র। কপালের মধ্যভাগে তৃতীয়-নয়ন ;—

জাগিয়া উঠিল মহেশ্বর
তিনকাল-ত্রিনয়ন মেলি
হেরিলেন দিক্‌-দিগন্তর।
প্রলয় পিনাক তুলি করে ধরিলেন শূলী
পদতলে জগৎ চাপিয়া,
জগতের আদি-অন্ত থরথর থরথর
উঠিল কাঁপিয়া।

সুপ্রাচীন বৈদিক যুগ থেকে ঐতিহাসিক যুগ পর্য্যন্ত সাধনা ও ভাবের সমন্বয়ে এই নটরাজের মূর্ত্তি কল্পনা গড়ে উঠেছে। খৃষ্টীয় নবম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ অধ্যায় পর্য্যন্ত চোল রাজগণের পৃষ্ঠপোষকতায় অমর শিল্পীবৃন্দ দক্ষিণ ভারতীয় দর্শন ও চিন্তার অনবদ্য অবদান রেখে গেছে এই নৃত্যভঙ্গিমাময় নটরাজ মূর্ত্তির মধ্যে। ভাবুক ও শিল্পীর প্রাণে এনে দিয়েছে জাগরণের স্পন্দন। তাই বিশ্বকবির চিত্ত ভরে উঠেছে নটরাজের নৃত্যের ছন্দে, তাইত তিনি গেয়েছেন—

নৃত্যের তালে তালে নটরাজ ঘুচাও সকল বন্ধ হে।
সুপ্তি ভাঙাও, চিত্তে জাগাও মুক্ত সুরের ছন্দ হে॥

নৃত্যে তোমার মুক্তির রূপ, নৃত্যে তোমার মায়া।
বিশ্বতনুতে অনুতে অনুতে কাঁপে নৃত্যের ছায়া ॥
তোমার বিশ্ব নাচের দোলায় বাঁধন পরায়, বাঁধন খোলায়,
যুগে যুগে কালে কালে সুরে সুরে তালে তালে
অন্তকে তার সন্ধান পায় ভাবিতে লাগায় ধন্ধহে ॥

সেই ভাব ও মহিমা ভরা মন্দির ও বিগ্রহ দেখে আমরা যখন বাইরে এসে পৌঁছলাম তখন দেখি বিমলদা স্থানীয় এক সরকারী আইনজ্ঞের সঙ্গে আলাপ সুরু করে দিয়েছেন। সেই আলাপ ও আলোচনার মারফতে জানতে পারা যায়—৭৫০০০ নরনারী নিয়ে এই চিদম্বরম্ সহর। দক্ষিণ ভারতে তিনটী প্রধান রাষ্ট্রের রাজত্বকালে এই স্থাপত্য ও শিল্প সম্ভারের বিকাশ হয়েছে। ভিন্ন পন্থাবলম্বী শৈব ও বৈষ্ণব মতের সহনশীল মনোভাব আধ্যাত্মিক সাধনার সহজগতিকে বাধা দেয়নি। যদিও সেইগতি কখনবা বাধা পেয়েছে সাময়িকভাবে কিন্তু মহাজ্ঞানী ও মহাপুরুষের আবির্ভাবে সমন্বয় প্রীতির মাধ্যমে সকল বিবাদের অবসান হয়েছে। অপর দিকে ছিল রাষ্ট্রনায়কগণের স্বাভাবিক শিল্পানুরাগ ও পৃষ্ঠপোষকতা। এইভাবে সকল দিক থেকে স্থাপত্য শিল্পের নৈপুণ্য ও নৃত্যরত শিবের শাশ্বত মূর্ত্তির রূপায়ন দক্ষিণ ভারতীয় দর্শন, চিন্তা ও শিল্পের রাজ্যে যুগান্তর এনে দিয়েছে।

এবার ষ্টেশনে ফিরে যেতে হবে, কিন্তু মন থেকে সহসা কেমন ক'রে ফিরে যাব? নবম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর

চোল শিল্পী ও জনপদ সমৃদ্ধ রাজত্বকালের কথা একসঙ্গে মনে পড়ে যায়। গ্রীষ্মের রুক্ষতা ও পিঙ্গলরূপ যেন সেদিনকার অমর শিল্পীবৃন্দের চিরন্তন রূপায়নের অপূর্ব্ব প্রতীক—এই নটরাজের কথা বলে যাচ্ছে। কত যাত্রী আসে আর ফিরে যায়। কেউ ভক্ত, কেউ শিল্পী কেউ বা দর্শক কিন্তু সবাই এখানে ভাবুক। মনের মধ্যে আসে প্রশ্ন কেউ বা তার উত্তর পায় কেউ বা পায় না।

কিছুদূরে এগিয়ে এসে পথের ধারে আমরা পেলাম গরুতে টানা ঝটকা (টাঙ্গা)। সহযাত্রীবৃন্দের সখ, এই ঝটকায় সামান্য পথটুকু অতিক্রম করা হবে। সকলে মিলে দুটী ঝটকায় ফিরে চলেছি Stationএর পথে। ঝটকাবাহী গরুগুলিও যেন নটরাজের দেশে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেছে। গরুগুলির শিং দুইপাশ থেকে ক্রমশঃ সরু হ'য়ে যেন কপালের মাঝখানে এসে মিশে গেছে আর মুখগুলি লম্বাটে ধরনের (দাক্ষিণাত্যের সমস্ত গবাদি পশুর এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়)। গলায় বাঁধা ঘণ্টা যেতে যেতে বেজে উঠ্‌ছে আর উঁচু নীচু পথে ওঠা নামার সঙ্গে সঙ্গে আমরাও দোলা খাচ্ছি। মন্দ লাগছে না। সহরে ট্রাম, বাস, মোটর চড়া অভ্যস্ত জীবনে এ এক নূতন অভিজ্ঞতা। কিছু দূর এগিয়ে এসে সেই ভোজনাগারের সামনে নেমে পড়লাম। কোন রকমে আমাদের ভোজন পর্ব্ব শেষ ক'রতে হ'ল। কারণ ভাষার দৈন্যে আমাদের খাদ্যবস্তু

নির্ব্বাচনে অনেক সময় গরমিল হয়ে যাচ্ছিল। তাই অল্প সময়ের মধ্যে আমরা সসম্মানে বিদায় নিলাম ষ্টেশনের উদ্দেশে।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর যাত্রী বোম্বাই ট্রেণ এল; বেলা তখন ১১টা। অতিরিক্ত ভিড়ের দরুণ একটী কামরায় কোনরকমে সমস্ত মালপত্তর বোঝাই ক'রে আমাদের 'ম্যানেজার' বিজয়বাবুর তত্ত্বাবধানে রেখে আমরা অন্য একটী কামরায় উঠে পড়লাম। বেলার সঙ্গে সঙ্গে তাপের মাত্রা ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে। কিছুদূর এগিয়ে যাবার পর শ্যামল শস্যভরা প্রান্তর আমাদের চোখে পড়ল। চিদম্বরমের পর থেকে ত্রিচিনাপল্লী অবধি মন্দ্রাস্ প্রদেশের অন্যতম উর্ব্বর স্থান বলতে পারা যায়। মাঝে মাঝে গোপুরম্ সমন্বিত নানামন্দির অতিক্রম করে চলেছি। সিদ্ধিদাতা গণপতি মন্দিরের প্রাচুর্য্যে মনে হ'ল এই দেবতা প্রত্যেক পল্লী ও গ্রামে বিশেষভাবে সমাদৃত। দীর্ঘ শব্দ সমন্বিত নাম অনন্তদেবপুরম্, মায়ভরম্ প্রভৃতি বড় বড় ষ্টেশন পিছনে ফেলে দেবমন্দিরপূর্ণ কুম্ভ কোণম্ অতিক্রম করলাম। এইস্থানে শাস্ত্রপাণি, রামস্বামী, কুম্ভেশ্বর, চক্রপাণি, নাগেশ্বর, নটরাজ প্রভৃতি বিগ্রহ ও মন্দিরগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মধ্যাহ্নের উত্তপ্ত বাতাস আমাদের বারে বারে পিপাসার্ত ক'রে তুলছিল। কখন জল কখনও বা আইসক্রীম তৃষ্ণা দূর করবার চেষ্টা করছিল। ২।১টী

ষ্টেশনে বেশ সস্তায় আঙ্গুর ফল পাওয়া গেল। এইরূপ উত্তপ্ত আবহাওয়ায় এই জাতীয় ফলের আস্বাদ সত্যি উপভোগের বস্তু। প্রায় Tanjore এর কাছে এসে গেছি। দেখলাম তাঞ্জোর রাজের এক অদ্ভুত খেয়াল। Railway line-এর দুধারে অপেক্ষাকৃত নিম্নস্থানে জলাভূমির মত বিস্তীর্ণ প্রান্তর পড়ে আছে। শোনা গেল সেই প্রান্তরে এককালে জল ধরে রাখা হ'ত। তাঞ্জোর রাজ তাঁর উচ্চ রাজপ্রাসাদ থেকে বহুদূরাবধি এই জলময় স্থানকে সমুদ্ররূপে কল্পনা ক'রে সমুদ্রদর্শনের আকাঙ্ক্ষা মেটাতে পারতেন! কথায় বলে রাজার খেয়াল। ৪-৪০ মিঃ আমরা তাঞ্জোরে পৌঁছলাম। কয়েকঘণ্টা মাত্র আমাদেয় সময় আছে। প্রথমে তাঞ্জোরের সুপ্রসিদ্ধ মন্দিরের উদ্দেশ্যে আমরা যাত্রা করি। ষ্টেশন থেকে পায়ে হেঁটে মাত্র পনর কি বিশ মিনিটের মধ্যেই আমরা মন্দিরের কাছে উপস্থিত হ'লাম। উচ্চ প্রাচীর আর এক জলাশয় মন্দিরের চারিদিক ঘিরে আছে। একদিকের জলাশয় শুকিয়ে গেছে। সমস্ত মন্দিরটী যেন একটী দুর্গের মধ্যে রয়েছে। মনে হয় বাইরের শত্রুর আক্রমণ থেকে মন্দিরকে রক্ষা করার জন্যই এইভাবে মন্দির নির্ম্মান করা হয়েছে। সম্মুখের বিশাল গোপুরম্ অতিক্রম ক'রে মন্দিরের বিরাট অঙ্গনে ঢুকেই দেখি একটী উঁচু মঞ্চ। একদিন এই নৃত্য মঞ্চে দেবদাসীদের পায়ের নূপুর বেজে উঠত আরতি ঘণ্টার

তালে তালে। এই নৃত্যমঞ্চের পরেই দেবাদিদেব মহাদেবের বাহন কৃষ্ণবর্ণের একটী বৃহদাকার বৃষের মর্ম্মর মূর্ত্তি। মাত্র একটী বিশাল গ্রানাইট পাথর থেকে এই মূর্ত্তি তৈরী হয়েছে। এই ভাগ্যবান বাহনের চারিটী পায়ে নরনারীর দেহ উৎকীর্ণ রয়েছে। এইরূপ গঠন কৌশলের অন্তর্নিহিত অর্থ কি ঠিক বুঝতে পারা গেল না। মন্দিরের অভ্যন্তরে শিবলিঙ্গের উচ্চতা প্রায় ১৩ ফিট। প্রধান মন্দিরের আসে পাশে অন্যান্য দেবদেবীর বিগ্রহ রয়েছে। এই মন্দিরের উচ্চতা প্রায় চৌদ্দতলা। দেবী পার্ব্বতীর বরাভয় মূর্ত্তি যেন আশাহীনের মনে ভরসা এনে দেয়। দেব সেনাপতি কার্ত্তিকেয় ময়ুরের উপর আসীন। তাঁর বারটি হাত···, দুই পাশে দুই স্ত্রী মূর্ত্তি (মনে হয় মহাভারতে কথিত কার্ত্তিকের পত্নীদ্বয় প্রজাপতিদুহিতা ও ষষ্ঠী দেবী)। এই মন্দিরের একটী কোণে সুড়ঙ্গ পথের ছিদ্র রয়েছে। গাইডের মুখে শোনা গেল, কোন এক রাজা আক্রমণের সময় এই সুড়ঙ্গ পথ ধরে মন্দিরের বাইরে পালিয়ে ছিলেন। কিন্তু এই তথ্য কতদূর সত্য তা বুঝা গেল না। করোরা নামে একজন বিখ্যাত সাধুর মূর্ত্তি দেখা গেল। কথিত আছে তিনি এই মন্দিরে শিবের প্রতিষ্ঠা করেন এবং আজও তাঁর মূর্ত্তি ভক্তি সহকারে পূজা করা হয়। এখানকার নটরাজের মূর্ত্তি দেখলাম পঞ্চধাতুতে নির্মিত।

সন্ধ্যার অন্ধকারে দিনের আলো ক্রমশঃ অস্পষ্ট হয়ে

যাচ্ছে। আমরা সেই স্বল্পালোকে মন্দিরের চারদিক ঘুরে ঘুরে দেখছি। দক্ষিণ ভারতের উচ্চতম মন্দিরের অঙ্গনের মাঝখানে আমরা দাঁড়িয়ে আছি। স্থানে স্থানে পরিত্যক্ত ভগ্নপ্রায় গৃহগুলি চোখে পড়ছে, মনে হচ্ছে এ যেন মহান কীর্ত্তির বেদনাময় পরিণতি। এককালে কত ভক্ত ও কত সেবায়েতের ভীড়ে সমস্ত মন্দির মুখরিত হয়েছে আর আজ যেন ভক্তির সঙ্গে ভক্তের দল কোথায় হারিয়ে গেছে। আজকার সভ্যতা-গর্ব্বিত মানুষের কৌতুক মেটাবার জন্য পড়ে আছে শুধু ঐতিহাসিক যুগের শিল্প, ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক পীঠস্থান।

আমাদের সকলেরই মনে তঞ্জোররাজের দরবার গৃহ দেখবার ইচ্ছা ছিল। মারাঠাবীর শিবাজীর বংশধরের রাজত্বকালের সাক্ষ্য নিয়ে আজও সেই দরবার গৃহ দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু মনের বাসনা মনেই রয়ে গেল কারণ ওদিকে ট্রেনের সময় এগিয়ে আসছে। রাত্রি প্রায় ৮৷৷০ টায় আমরা তাঞ্জোর ত্যাগ করলাম। এবার চলেছি আমরা ত্রিচিনাপল্লীর পথে। অবসাদের কথা ভুলে যাই। দেহের শ্রান্তি প'ড়ে থাকে একধারে, মনের আশা আর প্রাণের তৃপ্তি এগিয়ে নিয়ে যায় কবির গানে—

চলযাত্রী, চল দিনরাত্রি।

ক্ষণিক পরিচয়ের তাঞ্জোর দৃষ্টির অন্তরালে চলে যায়, শুধু জেগে থাকে সন্ধ্যার অস্পষ্ট আলোয় দেখা রাজরাজে-

শ্বরের সুপ্রসিদ্ধ মহাদেব মন্দিরের গাম্ভীর্য্যভরা রূপ। ত্রিচিনাপল্লী আর বেশী দূরে নয়। বৈদ্যুতিক আলোয় দীপ্যমান Stationএর মধ্যে আমাদের গাড়ী প্রবেশ করল রাত্রি প্রায় ১০টায়। Stationটীর সাতটী দীর্ঘ Platform উজ্জ্বল আলোয় সুন্দর দেখাচ্ছিল। মাটীর নীচে যাতায়তের পথ। সেই পথ দিয়ে যাত্রীবৃন্দ চলাফেরা করছে। underground lift এর সাহায্যে মালপত্র ওঠানামার বিরাম নাই। দক্ষিণ ভারতের এই Sationটী সত্যি মনে রাখার মত।

রাত্রি যাপনের উপযুক্ত বিশ্রাম স্থান অনুসন্ধান করতে গিয়ে অনেকটা সময় চলে গেল। রাত্রি ১২টার সময় সমস্ত ভোজনাগারের দরজাগুলি একে একে বন্ধ হ'ল আমাদেরই চোখের সামনে। তখনও আমরা অভুক্ত। Station এর বাইরে রঙিন আলো দেখে মনে হ'ল যেন কোন এক স্বপ্ন পুরীতে এসেছি। মনে পড়ে যায় ১৩।১৪ বছর আগের কয়েকটী সঙ্কটময় মুহূর্ত্ত। প্রবেশিকা পরীক্ষার আসামী। উপযুক্ত জবানবন্দী দিতে হবে সাধ্য ও অসাধ্য প্রশ্নের। চোখে দেখা আর না দেখার বালাই নাই, প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষের ব্যবধান নাই। কোন পরিত্রাণ নাই। যেমন ক'রেই হোক মনে করতে হবে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রায় মধ্যভাগের ঘটনা—ভারতের দুই প্রতিদ্বন্দী বৈদেশিক শক্তি; ইংরাজ ও ফরাসী দেশীয় রাজগণের দুর্ব্বলতার সুযোগ গ্রহণ

করে সামনাসামনি দাঁড়িয়েছে। এক পক্ষ মহম্মদ আলি আর অপর পক্ষ চাঁদ সাহেবকে অবলম্বন ক'রে ত্রিচিনাপল্লীর শান্ত জনপদকে অশান্ত ক'রে তুলেছিল। ইতিহাসে এই ঘটনাকেই কর্ণাটিক যুদ্ধের একটী অধ্যায়রূপে অভিহিত করা হয়েছে। মহম্মদ আলি, চাঁদ সাহেব অথবা ক্লাইভ, ডুপ্লে এদের কাউকে আর কোনদিন ত্রিচিনাপল্লীর বুকে দেখা যাবে না। কিন্তু কর্ণাটিক যুদ্ধ ও ত্রিচিনাপল্লীর শব্দের সঙ্গে ইতিহাস এদের চিরদিন বাঁচিয়ে রাখবে। সে দিনের সেই বই-এ পড়া ঘটনাস্থল আজ এমন সহজ ভাবে ধরা দেবে এটা সহসা আশা ক'রতে পারিনি। ইতিহাসে পড়া, ভূগোলে দেখা ত্রিচিনাপল্লী যেন সার্থক হয়ে উঠল ১৬ই মে ১৯৫৩ সালের মধ্যরাত্রে। এখানে সামরিক ঘাঁটি ও বিমানের অবস্থান স্থল দেখে মনে হ'ল অতীতের সামরিক গুরুত্ব এখনও বজায় রাখা হয়েছে।

প্রসিদ্ধ হোটেল Asoka Bhawanএর সামনে আমরা যখন পৌঁছলাম তখন রাত প্রায় ১টা। অভিজাত ও রুচিসম্পন্ন যাত্রীবৃন্দ ও ভ্রমণকারীর জন্য এই হোটেলটীতে উপযুক্ত ব্যবস্থা রয়েছে। প্রচুর জলের ব্যবস্থা থাকায় সমস্ত দিনের ক্লান্তি যেন স্নানাদির পরে মুছে গেল। অতিরিক্ত জল ব্যবহারে যে আর্থিক ক্ষতি স্বীকার ক'রতে হয় সেই নূতন তথ্যের প্রথম পরিচয় ঘটল এখানে। কারণ পরের দিন হোটেলের মালিককে তার নির্দ্দিষ্ট পাওনা চুকিয়ে

দেবার সময় অতিরিক্ত জল খরচের শাস্তিস্বরূপ আরও কিছু বেশী ধ'রে দিতে হ'ল। মাখন, রুটী ও কলার সমন্বয়ে রাতের আহার শেষ করলাম। ঘুমের মধ্যে বাকি রাতটুকু শেষ হয়ে গেল।

পরদিন সকালে কিছু জলযোগের পর আমরা এখানকার অন্যতম দর্শনীয় স্থান Rock-Fort Temple দেখতে বাসে ক'রে রওনা হলাম। জংসন station থেকে Temple পর্য্যন্ত ভাড়া নেয় ছ' আনা। বাসের পথে যেতে যেতে খৃষ্টানদের অনেক প্রতিষ্ঠান দেখে বোঝা গেল এখানে খৃষ্টান মিশনারীদের বেশ প্রভাব রয়েছে। মাঝে মাঝে আমাদের অন্যতম সহযাত্রী হিমাংশুদা পথের ধারে ২।১টী বস্তু লক্ষ্য করে সর্ব্বজ্ঞ গাইডের ভঙ্গীতে বর্ণনা ক'রছিলেন। তাঁর এই রসিকতা আমাদের সকলেরই বেশ ভাল লাগছিল। দূর থেকে Rock-Fort Temple দেখে মনে হ'ল যেন একটা প্রকাণ্ড হাতী পাষাণ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কিছুক্ষণ পরেই আমাদের বাস সেন্ট জেভিয়ার্স চার্চ্চের পাশে এসে থামল। তারই প্রায় সামনে Rock-Fort Temple-এ যাওয়ার রাস্তা। ভারতের সবচেয়ে প্রিয় নেতা নেতাজী সুভাষচন্দ্রের নামানুসারে এই প্রসিদ্ধ শৈল-দুর্গ পথের নামকরণ হয়েছে। প্রবেশ পথের বাঁদিকেই একটী জলকুণ্ড দেখতে পেলাম। পথের দুপাশে সাজান বাজার ও বাড়ী। বাজারের দোকানগুলি দুর্গের ভিতর পর্য্যন্ত এগিয়ে গেছে। দর্শনীয়

স্থানে এইভাবে দোকান সাজান খুব রুচিসম্মত ব'লে মনে হ'ল না। সামনের গোপুরম্ অতিক্রম ক'রে আমরা সিঁড়ি বেয়ে ক্রমশঃ ওপরে উঠতে লাগলাম। এই শৈল-মন্দিরের উচ্চতা প্রায় ২৬০ ফিট। দুর্গের মন্দিরগুলি বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন নামে অভিহিত—Uchi Vinayagar Temple, Tiruchinappali Rock, Upper Rock-cut cave, Temple of Siva. মন্দিরের কোন কোন অংশে পৌরাণিক যুগের নানা ঘটনাবলীর দৃশ্য পাথরের গায়ে শোভা বর্দ্ধন করছে। একটি নাটমন্দিরে নটরাজ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, গণেশ, পার্ব্বতী প্রভৃতি দেবদেবীর মূর্ত্তি মণ্ডপের দেওয়ালে অতি সুন্দরভাবে খোদাই করা রয়েছে। নৃত্য ও গীতের জন্য পৃথক সভামণ্ডপের ব্যবস্থা রয়েছে। শোনা গেল, এখনও নৃত্য ও গীতের আয়োজন হয়। নাটমন্দিরের একটী ধারে গ্রাণাইট পাথরে গড়া শিকল ওপর থেকে নীচে ঝুলছে। বিশ্বাস হয়নি প্রথমে যে পাথরে গড়া শিকল এমন লোহার শিকলের মত দেখতে হয়। হাত দিয়ে সেটা পরীক্ষা ক'রতেই অবিশ্বাসের আর কোন কারণ রইল না। এর পর আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল কয়েকটী পাথরের মূর্ত্তি—প্রাচীন ভারতীয় ভাস্কর্য্যের অপূর্ব নিদর্শন। সপ্তম শতাব্দীর কয়েকজন শক্তিশালী পল্লব রাজার মূর্ত্তি পাথরে খোদাই করা হয়েছে। এইগুলি দেখেই বুঝা যায় সে যুগে আমাদের দেশে এই শিল্প কত উৎকর্ষ লাভ করেছিল।

শৈল দুর্গের এক একটী স্তরে উঠে মাঝে মাঝে বাইরে তাকাবার সময় সমস্ত ত্রিচিনাপল্লীর রূপ এক সঙ্গে চোখের সামনে ভেসে উঠছিল। ক্রমশঃ আমরা পাহাড়ের চূড়ায় দুর্গশীর্ষে উঠলাম। এখানে গণপতির মূর্ত্তি রয়েছে। চারদিকের বিচিত্র দৃশ্য সম্ভার একসঙ্গে চোখে পড়ল'। মনে হ'ল নীল আকাশ যেন আমাদের দৃষ্টি পথের শেষ সীমায় বিলীন হ'য়ে গেছে। বিপরীত দিকে দাঁড়িয়ে আছে আর একটী হাতীর মত পাহাড় (Golden Rock)। বহু দূরাবধি নানাজাতীয় গাছপালায়ভরা প্রকৃতির কোলে যেন সবুজের হাট বসেছে। সেই সবুজ বনানীর বুক চিরে পুণ্যতোয়া কাবেরী নদী বয়ে চলেছে। দূর থেকে দেখা গেল তারই পুলের ওপর দিয়ে একখানি ট্রেন এগিয়ে যাচ্ছে যেন খেলা ঘরের গাড়ী। ছোট বড় কত রকমের ইমারত, মন্দির, মসজিদ, গীর্জ্জা তাসের ঘরের মত চারিদিকে সাজান রয়েছে। পাহাড়ের ওপর থেকেই মাটীর বুকের এমন শোভা ধরা পড়ে। ত্রিচিনাপল্লীর সামগ্রিক রূপ অনুভব করার প্রশস্ত স্থান এই শৈল-দুর্গের শীর্ষভাগ। একদিকে স্নিগ্ধ শীতল বাতাসের সুধাস্পর্শ, অপরদিকে নয়নাভিরাম দৃশ্য মনকে বাস্তবরাজ্য থেকে যেন অনেক দূরে নিয়ে যায়।

পাহাড়ের চূড়া থেকে নেমে আসতে আসতে ভাবছিলাম, এইসব স্থাপত্য শিল্প গড়ে উঠার কথা। মনে জাগছিল

সেই প্রতিভার কথা কত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করে, কত প্রতিকূল পরিবেশের মধ্য দিয়ে যার পরিপূর্ণতা ফুটে উঠেছে এইসব অনিন্দ্যসুন্দর রূপ কল্পনায়, পাথরের বুকে যা রেখে গেছে সেই প্রাণের স্পর্শ যা আজও গ্রীস বা রোমের স্থাপত্য শিল্প ও ভাস্কর্য্যের সমকক্ষ হয়ে রয়েছে।

নীচে নেমে দেখি প্রবেশ পথের সামনেই এক প্রকাণ্ড হাতী দাঁড়িয়ে আছে। নানারঙে রঙকরা শুঁড়টী এদিক ওদিক ঘোরাচ্ছে আর তার চারপাশে ছোট ছেলে মেয়েরা ভীড় ক'রে মজা দেখছে। দক্ষিণ ভারতে প্রায় সব মন্দিরেই এই রকম হাতী দেখতে পাওয়া যায়। উৎসব ও অভিষেকের সময় এদের রাখা হয় শোভাযাত্রার পুরোভাগে।

বেলা প্রায় ১০।১১টার সময় 'অশোক ভবনে' ফিরে এসে মধ্যাহ্ন ভোজন শেষ করা হ'ল। ঘণ্টা ২।৩ বিশ্রামের পর আবার আমরা সুপ্রসিদ্ধ শ্রীরঙ্গম মন্দির দর্শনের উদ্দেশ্যে বাসে করে যাত্রা করলাম। মন্দিরের সামনেই মহাত্মা গান্ধীর মর্ম্মর মূর্ত্তি রয়েছে। এখানেও প্রবেশ পথের দুপাশে নানা জিনিষের দোকান সাজান। এই মন্দিরের গোপুরমের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী। শিল্পরীতির দিক দিয়ে গোপুরমগুলির মধ্যে কিছু নির্ম্মাণ বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। প্রথমেই আমরা কণকস্তম্ভ অতিক্রম ক'রে শ্রীরঙ্গনাথজীর বিগ্রহ

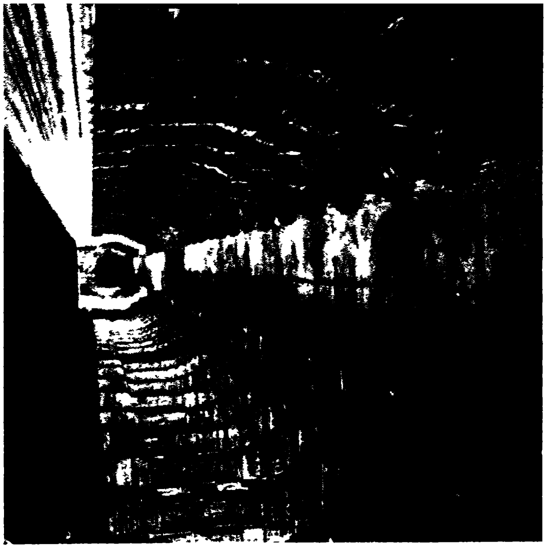
দর্শনের জন্য সাধ্যমত দেবতার চরণে পূজা ও প্রণামী দিলাম। পূজার শেষে কর্পূরের আলোয় দেখতে পেলাম শ্রীরঙ্গনাথজীর মূর্ত্তি (নারায়ণ মূর্ত্তি); পিছনে বিশাল পদ্মনাভ মূর্ত্তি অনন্ত শয়নে শায়িত। শ্রীরঙ্গনাথজীর অঙ্গে নানা মণিমুক্তা প্রদীপের স্নিগ্ধ আলোয় জ্বল্ জ্বল্ করছে। পূজারীদের দয়ায় আমাদের কপাল রাঙ্গা কুমকুমের টীপে ভ'রে গেল। চির রহস্যে ঘেরা ভগবানকে এরা যেন আরও রহস্যময় ক'রে তুলেছে অন্ধকার মন্দিরের অভ্যন্তরে। শুধু দক্ষিণার পরিমাণ অনুযায়ী ভক্তযাত্রীবৃন্দের জন্য মাঝে মাঝে কর্পূরের শিখা জ্বলে ওঠে। চকিতে আলোর শিখায় যেটুকু দেখা যায় তারই সঙ্গে অন্তরের ভক্তি যোগ করে তৃপ্তি পাওয়া ছাড়া আর কোন উপায় নাই। আমাদের ভাগ্যে কর্পূরের শিখা জ্বলে উঠেছিল স্পষ্ট দেখার দীপ্তি নিয়ে। মন্দিরের দুধারে বিশালকায় দ্বারপালের মূর্ত্তি। সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে দীপান্বিতা উৎসবের মত মন্দিরদ্বারে সংলগ্ন প্রদীপগুলি জ্বলে উঠল। একে একে লক্ষ্মীজী, বৈকুণ্ঠ-নারায়ণজী, রামচন্দ্রজীর বিগ্রহ দর্শন করলাম। শ্রীরঙ্গনাথজীর মন্দিরের বিপরীত প্রকোষ্ঠে শ্রীবিষ্ণুর বাহন গরুড়ের বিশাল মূর্ত্তি রয়েছে। এত বড় গরুড় বিগ্রহ অপর কোথাও আছে ব'লে মনে হয় না। ধর্মপ্রাণ ভারতবাসী ভগবানের সঙ্গে তাঁদের বাহনকেও ভক্তিঅর্ঘ্য দিতে ভুল করে না, এমন অনেক দৃষ্টান্ত তার রয়েছে। এই বিশাল মন্দিরে অনেকগুলি

সভামণ্ডপ অথবা নাটমন্দির। তার মধ্যে একটী নাটমন্দির সহস্রস্তম্ভে নির্মিত।

ফেরার পথে শ্রীরঙ্গনাথজীর মন্দির থেকে আমরা জম্বুকেশ্বর অভিমুখে অগ্রসর হলাম। মন্দিরের কাছে উপস্থিত হয়ে দেখি, অস্তমিত সূর্য্যের শেষ রশ্মি তখনও মন্দিরের চারিদিক স্পর্শ ক'রে আছে। মন্দিরটী দেখেই মনে হ'ল, অনেক দিনের পুরাতন। ভিতরে গিয়ে দেখি একটী শোভাযাত্রা মন্দিরকে প্রদক্ষিণ করছে জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্য্যের মূর্ত্তি নিয়ে। মূর্ত্তির পিছনে রয়েছে হাতী, বাদকের দল আর বন্দনারত চারণের দল। সে দিন ছিল জগদ্‌গুরুর আবির্ভাব দিবস। মন্দিরের ভিতর ঢুকে শোভাযাত্রা দেখতে দেখতে মনে হচ্ছিল আমরা যেন হাজার বছর আগেকার এক লোকালয়ে এসেছি। এখানকার জীবনযাত্রার সঙ্গে বুঝি আধুনিক যুগের কোন যোগাযোগ নেই। পর মুহূর্ত্তেই মনে করিয়ে দিল বৈজ্ঞানিক যুগের কথা—মন্দিরে হঠাৎ জ্বলে উঠা বৈদ্যুতিক আলো। চিদাম্বরমের নটরাজ মূর্ত্তি, জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্য্যের মূর্ত্তি ও পার্ব্বতীর মূর্ত্তি দর্শন ক'রে জম্বুকেশ্বর মন্দিরে গিয়ে দেখি বিগ্রহের দ্বার রুদ্ধ। দেবতার অভিষেক চলেছে। বাইরে তারই বাজনা বাজছিল। অভিষেকের শেষে জম্বুকেশ্বরের (মহাদেবের) আরতি হ'ল। আরতির পর আমরা ভিতরে প্রবেশ ক'রে দেখি জম্বুকেশ্বর মহাদেবের জল-মূর্ত্তি, লিঙ্গের চারপাশে সব সময় জল এসে জমা



গোপুরম্—নটরাজ মন্দির—চিদাম্বরম্



বিখ্যাত দালান (corridor)—রামেশ্বরম

শিলাস্তূপ-মন্দির—ত্রিচিনাপল্লী



হ’চ্ছে। একটী নির্দ্দিষ্ট স্থানে হাতরেখে দেখি, একটা ছোট্ট ছিদ্র দিয়ে জল উঠে এসে মহাদেবের মূর্ত্তিকে সব সময় প্রায় জলমগ্ন ক’রে রাখছে। মন্দিরের গায়ে একটী প্রাচীন জামগাছ দাঁড়িয়ে আছে। এই গাছের নাম থেকেই দেবতার নামকরণ হয়েছে ‘জম্বুকেশ্বর’। দেখে মনে হ’ল জাম গাছটীর তলদেশ মহাদেবের মন্দিরের নিম্নভাগ পর্য্যন্ত এগিয়ে গেছে।

সন্ধ্যা শেষ হ’য়ে এল। আমরা ফিরে এলাম ‘অশোক ভবনে’। ত্রিচিনাপল্লীর সঙ্গে প্রায় ২৪ ঘণ্টার পরিচয় এবার শেষে হবে। অল্প সময়ের মধ্যে জিনিষপত্তর গুছিয়ে নিয়ে Station এসে পৌঁছলাম। ট্রেনের অপেক্ষায় আমাদের মত অনেক যাত্রী দাঁড়িয়ে আছে। ওদেশীয় অনেক যাত্রীকে দেখি ভোজনাগার থেকে একটী দুটী কাগজের মোড়ক হাতে নিয়ে বেরিয়ে আসছে। জিজ্ঞাসা ক’রে জানা গেল ঐ মোড়কগুলির ভিতর ভাত ও তরকারী আছে। এই খাদ্য-মোড়কের ব্যবস্থা আমাদের চোখে নূতন লাগল। রাত্রি প্রায় ১০টার সময় ট্রেণ এসে পৌঁছল। এবার আমাদের গন্তব্য-স্থল দক্ষিণপূর্ব্ব ভারতের শেষ সীমা। সমগ্র ভারতে চারটী ধাম। পূর্ব্বে পুরী, পশ্চিমে দ্বারকা উত্তরে বদরী নারায়ণ আর দক্ষিণে রামেশ্বর। সেই পুণ্যতীর্থ রামেশ্বরধামের উদ্দেশে আমাদের যাত্রা সুরু হ’ল।

রামেশ্বরম্ ও ধনুষ্কোডি

বিজলী আলোয় ভরা ত্রিচিনাপল্লী Station দৃষ্টির অন্তরালে চ'লে যায়। ক্রমশঃ আমাদের গাড়ী ভারতের দক্ষিণপূর্ব্ব উপকূল ভাগ অবলম্বন ক'রে অন্ধকারের পথে এগিয়ে চলে। প্রায় ছয়ঘণ্টা পথের খবর অন্ধকারের কোলে আত্ম-গোপন ক'রে রইল। গাড়ীর ভীড়ে নিদ্রা, আর জাগরণে পথের সীমা শেষ হ'য়ে যায়। ভোরের আলোয় জেগে ওঠে রামনাদের শ্যামল শোভা। পাম্বান আর বেশী দূরে নয়। Mandapam থেকে দুটী Engine যুক্ত হ'য়ে পাম্বানের দিকে আমাদের গাড়ী এগিয়ে চলে। প্রভাত রবির রক্তিমাভা তখন দিক-চক্রবাল উদ্ভাসিত করে তুলেছে। একধারে বনরাজি, অন্য-ধারে বঙ্গোপসাগরের তরঙ্গমালা। মাঝে মাঝে ছোট ছোট দ্বীপ চোখে পড়ছিল। ক্রমশঃ স্থলভাগ সংকীর্ণ হয়ে এল; দুধারে জলরাশি, আমাদের গাড়ী তারই মাঝ দিয়ে এগিয়ে চলেছে। জলসিক্ত হাওয়া মায়ের স্নেহস্পর্শের মত ক্লান্তির মাঝে আনন্দের অনুভূতি রেখে যায়। কোথাও বা দেখি বালিভরা মাটীর ওপর বাবলা বনের সারি। এইভাবে আমরা বিখ্যাত পাম্বান Bridge-এর ওপর এসে পড়লাম। একদিকে মানার উপসাগর, অপরদিকে পক্ প্রণালী, তারই মাঝখানে এই Bridgeটী বিশালভারতকে যুক্ত ক'রেছে ছোট্ট পাম্বান দ্বীপের সঙ্গে। Bridge এর দুপাশে কোন আবরণ নাই, তাই বহুদূরাবাধি জলরাশি চোখে পড়ে। নীচের দিকে

তাকিয়ে দেখি জলের স্রোত আবর্ত্তিত হচ্ছে ছোটবড় অসংখ্য উপলখণ্ডে বাধা পেয়ে। প্রায় ১ মাইল দীর্ঘ Bridgeটী শেষ হ'ল। হঠাৎ মনে হল আমরা ভাবতবর্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন হলাম। সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করলাম বিশাল ভারতের রূপ—

হেথা একদিন বিরাম বিহীন
মহাওঙ্কারধ্বনি,
হৃদয়তন্ত্রে একের মন্ত্রে
উঠেছিল রনরনি।
তপস্যা বলে একের অনলে
বহুরে আহুতি দিয়া
বিভেদ ভুলিল, জাগায়ে তুলিল
একটি বিরাট হিয়া।

দেখতে দেখতে পাম্বান জংশন Stationএ পোঁছলাম। এখান থেকে একটী লাইন রামেশ্বরধাম, অপরটী তীর্থ ও বন্দর ধনুষ্কোডি পর্য্যন্ত এগিয়ে গেছে। জংশন Stationএ কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর আমাদের গাড়ী রামেশ্বরধামের দিকে এগিয়ে চল্‌ল। পাম্বান Stationএ অবস্থান কালে জনৈক পাণ্ডা 'বেরীর' মুখে এক অদ্ভূত প্রবাদবাক্য শোনা গেল। রামেশ্বর ধাম শঙ্করজীর স্থান, তাই এখানে কোন বস্তু পেষণ করা হয় না আর কেহ অবিবাহিত থাকে না। দুঃখের বিষয় এই অভিনব প্রবাদতত্ত্ব ভালভাবে যাচাই করবার অবসর আমরা পাইনি। আবার সেই বালিতে ঢাকা মাটীর উপর নারিকেল

গাছের সারি সুরু হল। কোথাও বা স্তূপাকারে বালুকারাশি আর তারই মাঝে মাঝে কোথাও বা গোছা গোছা গাছ বা বাবলা বনের সমারোহ। কোথাও দেখি প্রাচীন দেবালয়ের ধ্বংসাবশেষ লোকচক্ষুর আড়ালে ক্রমশঃ মাটীর তলায় ডুবে যাচ্ছে। একজায়গায় দেখি বালির পাহাড় দাঁড়িয়ে আছে আর তারই চারপাশে ঘিরে আছে তাল ও নারিকেল গাছ। পথের ধারে জনবসতি তেমন চোখে পড়ে না। প্রায় ভোর ৬টার সময় আমরা রামেশ্বর ধামের পবিত্র ধূ'লকণা স্পর্শ ক'রলাম। হাজার হাজার বছর ধরে কত ভক্ত ও সাধকের চরণ রেনুতে ভরে' আছে এই পবিত্র ধাম। ধীরে ধীরে Station-এ ট্রেণ এসে থামল—চোখে পড়ল বড় বড় অক্ষরে লেখা, 'রামেশ্বরধাম'। আজ থেকে সাতান্নবছর আগে বিশ্বহৃদয়জয়ী, বীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ ইউরোপ থেকে ফেরার পথে ভারতের এই দ্বীপে প্রথম পদার্পন করেন। রামনাদের রাজা স্বামিজীর সেই শুভ পদার্পনের চিহ্নকে পাম্বানের বুকে একটি স্মৃতিস্তম্ভে ধ'রে রেখেছেন। স্বামিজীর উদাত্ত কণ্ঠে ভারতের মর্মবাণী শুনতে সেদিন এই দ্বীপের ছোট বড় সবাই ছুটে এসেছিল। ভারতীয় আদর্শের জাগ্রত প্রতীক স্বামিজীর রাজোচিত অভ্যর্থনা স্মরণ ক'রে রামনাদবাসীর প্রতি আমাদের মন আজও শ্রদ্ধায় ভরে ওঠে।

Station থেকে স্থানীয় এক বিদ্যালয়ের শিক্ষককে

আমাদের গাইডরূপে পাই। তাঁরই কথামত আমরা ষ্টেশনের পাশেই মহাবীর ধর্মশালায় প্রথম উঠলাম। সেখানে কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর আমরা প্রসিদ্ধ মন্দিরের দিকে অগ্রসর হ'লাম। ভারতের অন্যতম তীর্থক্ষেত্র ব'লে এখানে বারমাসই নানাদেশের তীর্থযাত্রী দেখা যায়। মন্দিরের চারিদিকে গোপুরম্। সমুদ্রের দিকে অবস্থিত গোপুরমটী উচ্চতায় নয়তলা, নূতনভাবে এর সংস্কার হচ্ছে। প্রধান মন্দির প্রকোষ্ঠে প্রবেশের পূর্ব্বে সেবাইতগণের কাছে টেক্স বাবদ কিছু জমা দিয়ে টিকিট কিনতে হয়। যাঁরা পূজা দেবেন তাঁদেরই জন্য এই টিকিটের ব্যবস্থা। মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশের অধিকার সকলেরই আছে। ইতিমধ্যে দেবাদিদেব মহাদেব ও পার্ব্বতীর চরণে পূজা নিবেদনের জন্য আমরা সকলে একটী করে ডালা কিনে এনেছিলাম। এখানেও দেখলাম এই পূজা উপকরণের বিশিষ্ট অংশ নারকেল। টিকিট ও পূজার ডালা নিয়ে আমরা প্রথমে শ্রীশ্রীরামেশ্বরের মূর্ত্তির সামনে উপস্থিত হ'লাম। যে মূর্ত্তিকে দর্শনের জন্য ভারতের নানাদিক থেকে যুগ যুগ ধরে কত ভক্ত, কত যাত্রী ছুটে আসে আমরা সেই মহান মূর্ত্তির সামনে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। মহাদেবের এই লিঙ্গমূর্ত্তি আকারে বৃহৎ না হ'লেও বিগ্রহগাত্র বহুমূল্য রত্নরাজিতে ভূষিত। শোনা যায় এই মহানটের মূর্ত্তি ভগবান শ্রীরামচন্দ্র স্বয়ং প্রতিষ্ঠা করেন। প্রদীপ ও

কর্পূরের স্নিগ্ধ শিখায় বিগ্রহটী স্পষ্ট হয়ে আমাদের চোখের সামনে জেগে ওঠে। ওদিকে পূজার মন্ত্র ও আরতির শোভা সকলের মনকে তুচ্ছ দৈনন্দিন জীবনের বাইরে নিয়ে যাচ্ছিল। এইভাবে আমরা দেবী পার্ব্বতীর পূজাও দর্শন করলাম। মন্দিরে অপর বিগ্রহের মধ্যে রয়েছে পরমেশ্বর মহাদেব, লক্ষণেশ্বর মহাদেব, বিশ্বেশ্বর, গণেশ, চিদম্বরমের নটরাজ ও হনুমানজীর মূর্ত্তি। প্রধান মন্দিরের সামনে দেবাদিদেব মহাদেবের বাহন বিশালাকার বৃষের মূর্ত্তি সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মন্দিরের ভিতর ও বাইরে বিভিন্ন নামের কুণ্ড রয়েছে। ভিতরকার সবকুণ্ডই কূপের আকারে স্থাপিত। এই কুণ্ডের জল স্পর্শ ক'রলেই এক একটী তীর্থের জল স্পর্শ করা হয়। এমন কি 'সর্বতীর্থসার' নামে একটী কুণ্ড এখানে রয়েছে। ভক্তিপ্রাণ অনেক তীর্থযাত্রী এইসব কুণ্ডের জল অতি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্পর্শ করছেন। মন্দিরের স্থানে স্থানে স্তম্ভগাত্রে নটরাজ, পার্ব্বতী, গণেশ প্রভৃতি দেব দেবীর মূর্ত্তি অতি সুন্দর ভাবে উৎকীর্ণ রয়েছে। ভিতরের মত বাইরেও এইসব দেবদেবীর মূর্ত্তি প্রকাশের সার্থকতা কি— এই জিজ্ঞাসার সহজ উত্তর যেন সতীনাথদার কাছ থেকে খুঁজে পেলাম। সাধারণ ও অজ্ঞ মানুষের মনে সবসময় দেবময় ভাব ও পরিবেশ ফুটিয়ে তোলবার জন্যই বোধ হয় ভারতীয় ঐতিহ্যের একটী ধারা এইভাবে মন্দিরের চারধারে দেববিগ্রহ উৎকীর্ণ ক'রে রাখার নীতি গ্রহণ করেছে। মন্দিরের

একটী ধারে রয়েছে সুসজ্জিত বিবাহ মণ্ডপ। শোনা গেল প্রতি বৎসর আগষ্ট মাসের দিকে দেবদেবীর বিবাহ উৎসব এই মণ্ডপে সম্পন্ন হয়। মন্দিরের নানাদিক দেখতে দেখতে আমরা সমুদ্রতীরে উপস্থিত হ'লাম। সেখানে অনেক যাত্রী জড়ো হ'য়েছেন। তীরে দাঁড়িয়ে আমরা যখন দূরে পয়সা ছুঁড়ে দিচ্ছিলাম তখন ওখানকার ছেলেরা সাগরের বুক থেকে সেই ছুঁড়ে দেওয়া পয়সা কুড়িয়ে নেবার জন্যে নিজেদের মধ্যে হুড়াহুড়ি আরম্ভ করে। সাগরের জল এখানে স্থির ও স্বচ্ছ, তাই তার তলদেশে নিক্ষিপ্ত পয়সাকে প'ড়ে থাকতে দেখা যায়। এই সাগরের তীরে দাঁড়িয়ে আমাদের ২।১ খানি ছবি তোলা হল।

তীর থেকে ফিরে আবার আমরা মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করলাম। নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে প'ড়লাম কিছুক্ষণ সেই স্থাপত্য শিল্পের অপূর্ব নিদর্শন দরদালানের (Corridor) মাঝখানে। মাথার ওপর অপূর্ব কারুকার্য সমন্বিত চন্দ্রাতপ ও আশে পাশে স্তম্ভ। উত্তর ও দক্ষিণে এর দৈর্ঘ্য ৬৪২ ফিট, পূর্ব ও পশ্চিমে ৩৯৫ ফিট আর উভয় দিকের বিস্তৃতি ১৫½ ফিট। অপূর্ব কারুকার্য্য খচিত সহস্র স্তম্ভ এই সুপ্রসিদ্ধ দরদালানকে ঘিরে আছে।

এই দরদালানের মাঝ দিয়ে এগিয়ে যেতে যেতে মনে হ'ল আমরা যেন কোন এক রূপকথার প্রাসাদ পুরীতে অকস্মাৎ এসে পড়েছি। সার্থক হয়ে উঠেছে নাম না জানা

শিল্পীর এই নিখুঁত সৃষ্টি। দরদালানের একটী অংশে শঙ্খ, প্রবাল ও হরেকরকমের সামুদ্রিক রত্ন নিয়ে বসে আছে ব্যাপারীর দল।

ফেরার পথে মনে একথা স্পষ্ট হয়ে উঠল কেন ভ্রমণকারী ও তীর্থ যাত্রীবৃন্দ যুগের পর যুগ রামেশ্বরধামের দিকে ছুটে আসছে। মহাকাব্য যুগের পবিত্র স্মৃতি ও বর্ত্তমান ঐতিহাসিক যুগের স্থাপত্য শিল্পই আকর্ষণ ক'রছে ভারত-বাসীকে দিনের পর দিন এই পুণ্যতীর্থধামে। মন্দির-দর্শনে কিছু বেশী সময় অতিবাহিত হওয়ায় আমরা নির্দ্দিষ্ট গাড়ীতে উঠতে পারলাম না। পথের মাঝে একটি ভোজনাগারে নানারকমের মিষ্টান্ন সহযোগে সেদিনকার প্রাতঃভোজন শেষ করলাম।

রামেশ্বরধাম Station থেকে পাম্বান জংশনে ফিরে এলাম। এখান থেকে বেলা প্রায় ১-৫৫ মিনিটে প্রসিদ্ধ Indo-Ceylon Express ক'রে আমরা ধনুষ্কোডি Pierএর দিকে অগ্রসর হ'লাম। এই যাত্রা পথের দৃশ্যটুকু সত্যি মনে রাখার মত। গ্রীষ্মের খরদাহের বদলে স্নিগ্ধ বাতাস চারদিক ভরে আছে। চলন্ত গাড়ীর ভিতর দিয়ে দেখা একদিকে সাগরের নীল ফেনিল জলরাশি অপরদিকে কেয়াবনের মন মাতান গন্ধের স্পর্শ দেহ ও মনে অপার আনন্দের অনুভূতি রেখে যায়। মাঝে মাঝে বালি দিয়ে গড়া বিশাল পাহাড় পাশে ফেলে যাচ্ছি। মধ্যাহ্ন সূর্য্যের

কিরণ স্পর্শে সাগরের বিশাল জলরাশি নীলাভরূপ নিয়ে চিক্ চিক্ ক'রে উঠ্ছে। কখন দেখি দুধারে ধূ ধূ করছে বালি। সেই মরুভূমিতে মাঝে মাঝে ২।১টী গবাদি পশুর বিচরণ শুধু বিরাট শূন্যতার মাঝখানে সজীবতার সাক্ষী দিচ্ছে। সাগরের ভিজে হাওয়ার সঙ্গে কখন কেয়া ফুলের গন্ধ ভেসে আসছে, কখন বা গাড়ীর মধ্যে উত্তাল তরঙ্গমালার উদ্বেলিত জলকণা বাতাসের সঙ্গে ছিটকে এসে আমাদের গায়ে রেখে যাচ্ছে তার স্নিগ্ধ স্পর্শ।

এইভাবে আমরা ধনুষ্কোডি Pier-এ এসে পোঁছলাম বেলা তখন প্রায় ৩টা। ট্রেণ গিয়ে দাঁড়াল Ceylon এর জাহাজের প্রায় পাশে। এখানে যাত্রীবৃন্দকে কিছুক্ষণ অপেক্ষা ক'রতে হয় কারণ ভারতীয় ইউনিয়ন ও সিংহলগামী যাত্রীবৃন্দের জন্য ছাড়পত্রের ব্যবস্থা রয়েছে। ট্রেণ ছেড়ে ছাড়পত্রের ব্যবস্থা নিয়ে Ceylon গামী যাত্রীবৃন্দ একে একে জাহাজে গিয়ে ওঠে। ট্রেনটী পড়ে থাকে লাইনের ওপর। এই ট্রেনই আবার অমাদের নিয়ে যাবে ধনুষ্কোডি Stationএ। সেই অপেক্ষার অবসরে আমরা ট্রেন থেকে নেমে সাগর তীরে দাঁড়ালাম। ওপার থেকে Ceylon এর ডাক কই, আমরা ত' পেলাম না। বোধ হয় সে ডাকের সময় এখনও হয়নি। তাই মানচিত্রে দেখা, ইতিহাসে পড়া, সিংহল ওপারেই র'য়ে গেল। শুধু কল্পনায় অনুভব করলাম হাজার হাজার বছর আগে একদিন

শ্রীরামচন্দ্রের পূত স্পর্শে ধন্য সেই লঙ্কাদ্বীপকে যে আজ কাছে থেকেও দূরেই রয়ে গেল। সেই সুপ্রাচীন যুগের ইতিকথা আজও চিরপ্রবহমান সাগরের তরঙ্গোচ্ছ্বাস অনন্ত ও অব্যক্ত ভাষায় প্রকাশ ক'রে যাচ্ছে। ওপারের যাত্রী প্রস্তুত হ'ল, এপারের আমরা ফিরে এলাম ধনুষ্কোডি Stationএ। সাগরতীরে তরঙ্গপ্লাবিত বালুকাময় ভূখণ্ডের উপর এই Station। ভারতের নানাদিক থেকে অসংখ্য যাত্রীকে টেনে আনে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের অপূর্ব্ব কীর্ত্তি সাগরের বুকে সেতু বন্ধনের চিহ্ন দেখবার জন্যে। Station থেকে তীর্থ ক্ষেত্রের দূরত্ব প্রায় আড়াই মাইল। আমাদের সময় আছে মাত্র কয়েক ঘণ্টা কারণ ঐ দিন সন্ধ্যায় মাদুরার দিকে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। তাই মালপত্তর ফেলে সকলের ভাগ্যে তীর্থক্ষেত্র দেখা সম্ভব হ'ল না। তীর্থস্থানে উল্লেখযোগ্য কিছু নাই। বড় বড় পাথর বিক্ষিপ্ত ভাবে সাগরের বুকে প'ড়ে আছে এবং এইগুলিই সেই প্রাচীন যুগের স্মৃতি বহন ক'রছে সেতুবন্ধনের সাক্ষ্যরূপে। এই সুপ্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্রের নামকরণের একটী প্রবাদ পাণ্ডাদের ব্যাখ্যায় জানতে পারা যায়। শ্রীরামচন্দ্র সমুদ্রের প্রার্থনায় স্বর্ণ ধনু দিয়ে সেতু বন্ধন ভেঙ্গে দেন আর ঐ ধনু কোটিভাগে ভাগ করে ব্রাহ্মণদের স্বর্ণদান করা হয়। স্বর্ণ ধনুকে কোটি-ভাগে ভাগকরার প্রবাদ থেকেই এস্থানের নামকরণ হয়েছে ধনুষ্কোটি।

যেটুকু সময় আছে তারই মধ্যে এই সুপ্রাচীন দ্বীপকে জানবার ইচ্ছা মনকে ব্যাকুল ক'রে তোলে। তাই একলা নেমে পড়ি Station এর Waiting Room থেকে বাইরের খোলা সমুদ্র তীরে। Stationএর ছোট্ট ঘর থেকে দেখা সাগরের তরঙ্গ গর্জ্জন যেন হাতছানি দিয়ে ডেকে নিল। চলার পথে দেখি বালির ওপরে গড়ে উঠেছে মানুষের বাঁধা ঘর। এদের ঘরগুলি একেবারে সাগরের কোল পর্য্যন্ত এগিয়ে গেছে, অনেকবার ভেসেও গেছে সমুদ্রের মধ্যে। ক্রমশঃ এগিয়ে যাই জলের কাছে। নির্ব্বাক হয়ে তাকিয়ে থাকি সেই অনন্ত নীল জলরাশির উচ্ছ্বসিত তরঙ্গমালার যাওয়া আসার দিকে। আমার ভাষা যেন কোথায় হারিয়ে যায়। তীরে বাঁধা ঘরগুলি থেকে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ঢেউ আসার আগে বালি দিয়ে তাদের খেয়াল মত কতরকমের খেলাঘর তৈরী করে আর ঢেউ আসার সঙ্গে সঙ্গে তারা পিছিয়ে যায়। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে তাদের গড়া খেলাঘর কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে গেল পাগল ঢেউ তার ঝাপটা দিয়ে। তারা আবার গড়ে, আবার ভাসিয়ে নিয়ে যায়। শিশুদের এই ব্যর্থখেলা দেখে মনে পড়ে আমাদের খেলা। আমরাও এমনি ভুলের বালুচরে কত বাসনার বাসাই না বাঁধি। নিষ্ঠুর বাস্তবের তরঙ্গ এসে সেই ভুলে গড়া বাসাকে ভেঙ্গে দিয়ে যায়। কখন দেখি আমারই আশেপাশে ঘরগুলির মধ্যে সাগরের বুক থেকে এক একটী ঢেউ হুহু শব্দে ছুটে আসছে,

আবার ফিরে যাচ্ছে তার স্পর্শ চিহ্ন রেখে। এমনি ক'রেই হয়ত একদিন বাঁধা ঘরগুলিকে সাগর তার নিজের বুকে টেনে নেবে। জানিনা কতক্ষণ আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম সেই অসীম সাগরের লীলা চঞ্চল মূর্ত্তির দিকে তাকিয়ে। প্রকৃতির এই উন্মাদনার কাছে মানুষের গড়া জিনিষ কতটুকু শক্তি ধরে? দুগ্ধফেননিভ পুঞ্জীভূত তরঙ্গবাহু বারে বারে আপন তটদেশে আলিঙ্গন ক'রে তীরের 'পরে রেখে যায় আপন বক্ষের নানা রত্নরাজি আবার ভাসিয়ে নিয়ে যায়—আপনার দেওয়া জিনিষ—এই দেওয়া নেওয়ার পালা যেন শেষ হয় না। বাইরে যার এত উন্মাদনা, এত চঞ্চলতা, ভিতরে তার কি রূপ? মনে পড়ে বিশ্বকবির লেখা কটী ছত্র—

গভীর অন্তর তার নিস্তব্ধ গম্ভীর
কোথা তল, কোথা তীর;
অগাধ তপস্যা যেন রেখেছে সঞ্চিত করি—

সেই সুদূর অতীতের মহান স্মৃতি আর এই লীলা চঞ্চলময়ী প্রকৃতির অফুরন্ত আবেগময় তীরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আমরা যেন নিজেদের হারিয়ে ফেলি। আচ্ছন্ন হয়ে কোন এক অবসরে যখন বিশ্রামঘরের জানালার ধারে দাঁড়িয়ে পড়ি তখন দৃষ্টি চলে যায় উচ্ছলিত সাগরের নীল জলরাশির দিকে আর মন চলে যায় অনেক দূরে……কোন্ অজানা, অচিন দেশের পরপারে।

ধনুষ্কোডি থেকে মাদুরা

দেখতে দেখতে দিনের আলো ক্রমশঃ নিভে গেল সকলে আবার এক জায়গায় হাজির হলাম। Station-এর পাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে মাদুরাগামী ট্রেনটী। ইতিমধ্যে আমাদের ম্যানেজার বিজয়বাবু Stationএর এক রেষ্টুরেণ্টের সঙ্গে এমন ব্যবস্থা ক'রলেন যাতে ট্রেনটি ধনুষ্কোডি ত্যাগ করবার আগেই আমাদের খাওয়া দাওয়া শেষ হ'য়ে যায়। যেমন ব্যবস্থা, তেমন কাজ। সঙ্গে সঙ্গে ট্রেনের কামরায় ভোজ্য বস্তু যথা সময়ের মধ্যে পরিবেশন করা হ'য়ে গেল। এবার আমরা দিনের আলোয় ধনুষ্কোডির পবিত্র ভূমি ত্যাগ ক'রে রাতের আঁধারে মাদুরার পথে পাড়ি দেবো। কি জেনেছি, কতটুকু দেখেছি তার সত্যিকারের হিসাব দেবার ক্ষমতা আমার নাই। শুধু এইটুকু জানা রইল যে এই জনবিরল প্রান্তরে দাঁড়িয়ে কে যেন আমাদের সকলের মনকে কোন সুদূর অতীতের দিকে বার বার টানছিল।

ধনুষ্কোডির বালুকাময় প্রান্তর দিয়ে গাড়ী ছুটে চলেছে। পবনদেব হু হু শব্দে আপনার বিজয় অভিযান বার্ত্তা ঘোষণা করে চলেছে। পথের দুপাশে জমাট অন্ধকারে বালিতে ভরা তীর আর সাগর যেন এক হ'য়ে মিশে গেছে। অতি পুরাতনের সমস্ত স্মৃতি যেন এক রহস্যময় পরিবেশে আত্মগোপন ক'রে রইল। জেগে আছে শুধু ভাষাহীন নীরব

ইঙ্গিত। সেই অনন্ত নিস্তব্ধতাকে ভেদ করে যেন ভেসে উঠছে—

কথা কও, কথা কও,
অনাদি অতীত, অনন্তরাতে কেন বসে চেয়ে রও।
কথা কও, কথা কও।

শুধু উপলব্ধি আর সেই সীমাহারা চিন্তার ব্যাকুলতা সারা মনকে আচ্ছন্ন ক'রে দেয়। আঁধার রাতের এই অনন্তের লীলা—এর শেষ কোথায়?

গ্রীষ্মের রুক্ষতা এখানে নাই। মাঝে মাঝে সমুদ্রসিক্ত শীতল বাতাস ক্লান্ত দেহ ও মনে এনে দেয় ঘুমের আবেশ। কত যুগ যুগান্তরের এই ধনুষ্কোডি প্রান্তরের বুকের ওপর দিয়ে গম্ গম্ শব্দে গাড়ী এগিয়ে এলো পাম্বান্ Bridgeএর বুকে। মাথার উপর নক্ষত্র খচিত আকাশ, নীচে দুই পাশে উপসাগরীয় জলপ্রবাহ পাথরের গায়ে বার বার আছাড় খেয়ে প'ড়ছে। ঘন অন্ধকারের পথে আমাদের এই যাত্রা স্মরণ করিয়ে দেয় বিদ্রোহী কবির ছন্দ—

দুর্গম গিরি, কান্তার, মরু, দুস্তর পারাবার
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে, যাত্রীরা হুঁশিয়ার।

পারাবার শেষ হ'ল। পথের অন্ধকার যাত্রা পথের ছবিকে ঢেকে রাখে। রাত্রি প্রায় ১১টার পর আমাদের

গাড়ী Mana Madurai Junction Stationএ এসে পৌঁছল। যাত্রী ভারে ক্লান্ত গাড়ী এখানে কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর তার নির্দ্দিষ্ট পথে এগিয়ে যায়। আমরাও সুপ্রসিদ্ধ তীর্থভূমি, মাদুরার পথে, নূতন ক'রে যাত্রা সুরু করি। রাত্রি প্রায় ১-৩০ মিঃ, আমরা মাদুরার পুণ্যভূমি স্পর্শ ক'রলাম ; সারা সহর তখন ঘুমিয়ে আছে। যাত্রীদের অপেক্ষায় যারা চিরদিন জেগে থাকে তাদেরই কয়েকজন পরিচিত ও অপরিচিত জনকে আহ্বান ক'রতে এগিয়ে আসে। Madras Stateএর দ্বিতীয় বৃহত্তম নগরী মাদুরা, দক্ষিণ ভারতের এথেনস্ নামে অভিহিত। দাক্ষিণাত্যের পাণ্ড্যরাজগণের উত্থান পতনের ইতিহাস এই মাদুরার সঙ্গে জড়িয়ে আছে। এক সময়ে পাণ্ড্যরাজগণের রাজধানী ছিল এই মাদুরা। এই নগরী এককালে সামুদ্রিক বাণিজ্য উপলক্ষ্যে, আরব ও চীন দেশের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন ক'রেছিল। আজও মাদুরার বস্ত্র শিল্পের কথা কে না জানে? প্রাচীন বাণিজ্যশ্রীতে সমৃদ্ধ এই মাদুরা বর্ত্তমান যুগেও তামিল সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হিসাবে সভ্যজগতের কাছে বিশেষ ভাবে পরিচিত। পুরাতন দিনের অনেক স্মৃতি ও শিল্পকলার নিদর্শন মাদুরার বুকে আজও জেগে আছে।

রাত্রি ক্রমশঃ এগিয়ে চলেছে। ঐতিহাসিক অথবা ভৌগলিক তথ্যের কথা শোনাবার অবসর কোথায়? Stationএর কাছেই একটী Hotelএর সন্ধান পাওয়া গেল।

এই গভীর রাত্রে আমরা Hotelএ গিয়ে উঠলাম। ভালমন্দ বিচারের তখন কোন ক্ষমতা ছিল না। যাত্রাক্লান্ত পথিকের চোখ ঘুমের ঘোরে জড়িয়ে আসে। যখন চোখ মেলি, দেখি অনেক আগেই ভোর হয়েছে। ঘরের বাইরে এসে প্রথমেই চোখে পড়ল মহেশ্বর শিব ও দেবী মীনাক্ষী মন্দিরের সোনায় মোড়া চূড়া দুটি সূর্য্যের আলো পড়ে ঝলমলিয়ে উঠেছে। কিছুক্ষণ পরেই একজন গাইড এই অজানা দেশে আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার জন্য উপস্থিত হলেন। অল্প সময়ের মধ্যে প্রস্তুত হ'য়ে আমরা মাদুরার মহামন্দিরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করি। পথে নেমেই মনে হ'ল আমরা যেন এক পরিচিত সহরের মাঝ দিয়ে চলেছি। এখানকার ঘরবাড়ী সবেতেই যেন পুরাতনের ছাপ র'য়েছে। আমরা অল্পক্ষণের মধ্যেই গোপুরমের সামনে উপস্থিত হ'লাম। প্রায় দশ তলা সমান দশটি গোপুরম্ এই মহামন্দিরের প্রবেশ পথে মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাজার নির্মিত ব'লে গোপুরমগুলির গঠনের মধ্যে কিছুটা বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। মন্দিরের ভিতর একটী জায়গায় দেখি ৫।৬টী পাথরে তৈরী দুটী স্তম্ভ দাঁড়িয়ে আছে। গাইডের নির্দ্দেশ মত আমরা যখন এক টুকরা পাথর নিয়ে সেই স্তম্ভের এক একটী পাথরে আঘাত করি তখন পিয়ানো বাজনার মত এক একটী সুর বেজে ওঠে। শিল্পীর এই অপূর্ব্ব নির্ম্মাণ

কৌশল আমাদের সবাইকে চমকিত করে। পাথরের স্তম্ভে আঘাত দিয়ে পরীক্ষা করে দেখি, সত্যি এই স্তম্ভের ভিতরটা ফাঁকা না অন্য কিছু ধাতুর পদার্থে ভরাট হয়ে আছে। পরে সন্দেহ রইল না যে স্তম্ভগুলি শুধু পাথরেরই। শিল্পের এই অভিনব কৌশল আজকের দুনিয়ায় আর বিশেষ দেখা যায় না। মন্দিরের একটী অংশ জলাশয় আর তারই পাশে সহস্র স্তম্ভের দালান ঘর। এই দালান ঘরের প্রতি সারিতে ১০০টী ক'রে স্তম্ভ দাঁড়িয়ে আছে। প্রত্যেকটী স্তম্ভই শিল্প নৈপুণ্যের পরিচায়ক। এই বিশাল দালান ঘর অতিক্রম ক'রে আমরা চন্দন কাঠে তৈরী বিচিত্র কারুকার্য্যে ভরা বিবাহ মণ্ডপে উপস্থিত হলাম। চন্দনের সুগন্ধে চার-দিক্ ভ'রে আছে। চন্দনহীন দেশে এমন সুন্দর আয়োজন কেউ কল্পনাও ক'রতে পারে না। প্রতি বছর চৈত্র মাসে এই মণ্ডপে সুন্দরেশ্বরম্ মহাদেব ও মীনাক্ষী দেবীর শুভ পরিণয় উৎসব সম্পন্ন হয় কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় আমরা এমন সময়ে এখানে এসে প'ড়েছি যখন কন্যাযাত্রী অথবা বরযাত্রী কোনটাই হবার সম্ভাবনা নাই। তাই শুধু গল্প কথা শুনেই তৃপ্তি পেতে হ'ল। এই সব ব্যবস্থা দেখে মনে হয় ভারতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি শুধু দেবতাকে দূরে রেখে শ্রদ্ধা জানায়নি, তারা নিজেদের সামাজিক জীবনের সঙ্গে আপন ক'রে নেবার জন্য নানা বাহ্যিক অনুষ্ঠানের আয়োজনও ক'রেছে। মীনাক্ষী দেবীর মন্দিরের সামনে

গিয়ে দেখি দরজার কাছে হাজার প্রদীপের মালা সাজান র'য়েছে। সন্ধ্যারতির সময়ে ঐ প্রদীপের আলো স্নিগ্ধ আভায় চারদিক শোভিত করে। দেবীর সর্ব্বাঙ্গে হীরক ও স্বর্ণের আভরণ। দেবীর মৎস্য চক্ষু—দুটী চোখে হীরা, কানে হীরা আর নাকে হীরা জ্বল জ্বল ক'রছে। দেবীর হাত ও পা সোনায় মোড়া, মাথায় রয়েছে সোনার মুকুট। সকলে মিলে দেবীর চরণে পূজা নিবেদন করি। পূজারীবৃন্দ একুশ গিনিতে মণ্ডিত সোনার মুকুট আমাদের প্রত্যেকের মাথায় একবার করে পরিয়ে দেন। হ'লইবা ক্ষণিকের আভরণ তবুও সে সান্ত্বনা হয়ে থাক অপূর্ণ জীবনের মাঝে। দেবীর গলার মালা মাথায় পরে সুন্দরেশ্বরম্ মহাদেবের চরণ বন্দনা করি। দেবীর কুম্‌কুম্, শঙ্করের ভস্মে ভূষিত হ'ল আমাদের কপাল। আর সেই সঙ্গে মাথায় দেবীর কণ্ঠের মালা নিয়ে আমরা মন্দির প্রদক্ষিণ করি। মন্দিরের ভিতরে রয়েছে ১০০টি গণপতির মূর্ত্তি বিভিন্ন নামে। একটী ধারে টিয়া আর কাকাতুয়া খাঁচায় বন্ধ র'য়েছে। একটী ঘরে রূপার তৈরী নটরাজ মূর্ত্তি দেখলাম। এই নটরাজ মন্দিরের কারুকার্য্যময় চত্বরটী স্থানীয় ব্যবসায়ীদের সাহায্যে তৈরী। শোনা গেল কিছুদিন পূর্ব্বে মাননীয় রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রাসাদ স্বয়ং মন্দিরের এই দিকটী উদ্বোধন করেন। এখানে কাশীর বিশ্বনাথ ও বিশালাক্ষীর মূর্ত্তি দেখলাম। মীনাক্ষীদেবীর মন্দিরের

অন্যধারে একটী মণ্ডপে রাজা তিরুমল নাইক ও তাঁর দুই রাণীর মূর্ত্তি দেখা গেল। এই মূর্ত্তিগুলির পাশ দিয়ে রাণীরা আসতেন মন্দিরে। এই মণ্ডপের এক একটী অংশে বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্ত্তি আর সেই সঙ্গে নটরাজের নৃত্যময় ভঙ্গিমা লক্ষ্য ক'রলাম। কাল পাথরের মূর্ত্তিটি আকারে বেশ বড়। অপূর্ব্ব এর রূপ কল্পনা। মন্দিরের একটী ধারে দেখি একটী শুক্‌না কদম্‌ গাছ দাঁড়িয়ে আছে। অতীত কালের সাক্ষী এই গাছের ইতিকথা জানতে গিয়ে আমরা অবাক হয়ে গেলাম। শুনলাম ঐ গাছটীর বয়স মাত্র ১০২৫ বৎসর।

সুন্দরেশ্বরম্‌ মহাদেব আর মীনাক্ষী দেবীর মন্দিরের চূড়া অনেক দূর থেকে দেখা যায়। সূর্য্যের কিরণ স্পর্শে সোনার মন্দির চূড়া ঝল্‌মল্‌ ক'রে সারা সহরকে আলোকিত ক'রে রাখে। তবে দেবী মীনাক্ষীর মন্দির চূড়াই আকারে বড়। চারদিকে প্রকাণ্ড প্রাচীর দুর্গের মত মন্দিরকে ঘিরে রেখেছে। মন্দিরের চারদিকে ছোট বড় অসংখ্য বাড়ী দেখা গেল। দেবদেবী দর্শনের পর আমরা যখন বাইরে এসে পৌঁছলাম তখন দেখি আমাদেরই চারপাশে বেশ একটী ছোট জনতার ভীড় জমে গেছে। আমাদের গলায় ও মাথায় দেবীর প্রসাদী মালা; আমরা সেই অবস্থায় দাঁড়িয়েছি ক্যামেরার সামনে। আমাদের ইচ্ছা, এই অপরূপ সাজ আর প্রসিদ্ধ তীর্থস্থানের স্মৃতি একই সঙ্গে ছবিতে ধরা থাকুক। 'ক্লিক্‌' করার সঙ্গে সঙ্গে

আমাদের ছবি তোলা শেষ হল। চেয়ে দেখি আমাদের ঘিরে চারদিকে বেশ ভীড় জমতে সুরু ক'রেছে। মন্দির থেকে বেরিয়ে যখন মাদুরা সহরের কয়েকটী দোকানে ঘোরাফেরা করছি তখন দেখি উৎসুক কয়েকটী দৃষ্টি আমাদের দিকে নিবদ্ধ র'য়েছে। সকলেরই মনে হয়ত এই জিজ্ঞাসা, এরা আবার কোন আজব দেশের মানুষ? মন্দ লাগছিল না কারণ অল্প সময়ের মধ্যে আমরা দর্শনীয় হ'য়ে উঠেছিলাম। বাঙ্গালী সব সময়েই নিজের বৈশিষ্ট্য রেখে যায়। কখনও তার খেয়ালে কখনও বা তার স্বভাবজাত রসিকতায় এই ধরণের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়। আমাদের মুখে বাংলা ভাষা আর সাজের এই অভিনবত্ব দেখে হঠাৎ একজন বাঙ্গালী পরিব্রাজক আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন। জন্মভূমি ছেড়ে এই বাঙ্গালী পরিব্রাজক প্রায় ১৪ বৎসর ভারতের বিভিন্ন অংশে ঘুরে দক্ষিণ ভারতে এসেছেন। পরিচয় সূত্রে জানা গেল তিনি স্বনামধন্য দানশীল স্বর্গীয় মতিলাল শীলের বংশধর। জন্মভূমির মানুষ আর জন্মভূমির ভাষা শুনে সেই বাঙ্গালী পরিব্রাজক বিশেষ অভিভূত হ'য়ে পড়েন। বুঝলাম দেশছাড়া না হ'লে দেশের প্রতি সত্যিকারের দরদ কেউ বুঝতে পারে না।

মাদুরা সহরবাসীর সপ্রশ্ন দৃষ্টির ভিতর দিয়ে ছুটী 'ঝটকা' ক'রে আমরা সুপ্রসিদ্ধ রাজপ্রাসাদের সামনে উপস্থিত হ'লাম। সপ্তদশ শতাব্দীর (১৬২৩ খৃঃ থেকে ১৬৫৯ খৃঃ)

রাজা তিরুমল নাইকের নামানুসারে এই রাজপ্রাসাদের নামকরণ হয়েছে। মধ্যযুগীয় হিন্দু স্থাপত্য শিল্পের অপূর্ব্ব নিদর্শন এই রাজপ্রাসাদ। বড় বড় থাম ঘিরে আছে এই প্রাসাদকে। এর মধ্যে প্রবেশ ক'রলেই দেখা যায় একটী পাশে প্রধান মন্ত্রী ও অপর একটী পাশে দ্বিতীয় মন্ত্রীর দপ্তরখানা র'য়েছে। আজ সেই দপ্তর ছুটী জাতীয় গভর্ণমেণ্ট মাদুরা Sub-Div. Court ও রামনাদ Sub-Div. Court হিসাবে ব্যবহার করছেন। ঢুকে সোজা চলে এলেই সামনেই পড়ে বিবাহ মণ্ডপ ও রাজদরবার। এখানকার ছবি ও শিল্প আধুনিক রুচি ও বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দেয়। এরপর আমরা রাণী মহল দেখলাম। অন্তঃপুরে বিলাসময় জীবন যাপনের সব কিছু সুবিধা এখানে রয়েছে। পুরাতনের সেই শিল্প সম্ভার ও আয়োজন আজ শুধু দর্শনের সামগ্রী হ'য়ে শোভা পাচ্ছে। কিন্তু সেই পুরাতন মানুষ আর তার খেয়ালী প্রয়োজন আজ কোথায়? কত যত্ন কত আশা জমাট হ'য়ে ভ'রে ছিল এই রাজপ্রাসাদের কক্ষে কক্ষে ও অন্দরে অন্দরে, কত আনন্দ ও বিরহের বেদনা ফুটে উঠেছে দিনের পর দিন এই রাজপ্রাসাদের মানুষের দৈনন্দিন জীবনের পটভূমিকায়। অতীতের প্রাণবন্ত প্রাসাদ আজ শুধু কর্ম্ম চঞ্চল মানুষের যাওয়া আসার কেন্দ্র হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।

ভাল লাগে এই সব পুরাতন স্মৃতি আর ঐশ্বর্য্যের নিদর্শন কিন্তু ভাল লাগে না তার মিথ্যা অপব্যবহার। শুধু সরকারী

দপ্তরখানায় রূপান্তরিত না হ'য়ে আজ যদি রাজপ্রাসাদ শিক্ষা ও সংস্কৃতির একটী কেন্দ্র হত তাহলে মনে হয় অতীত স্মৃতির গাম্ভীর্য্যভরা রূপ আরও সুন্দর ভাবে ফুটে উঠত। বর্ণের অক্ষরমালা যে কথা ব'লতে পারেনা, স্মৃতির নিদর্শন তার অনেকখানি ব'লে যায়। যা কিছু সুন্দর, যা কিছু অনুপম তাকেই আমরা ধ'রে রাখবার চেষ্টা ক'রব, এইটুক ভরসা সভ্যসমাজের প্রত্যেক মানুষ ও দেশের কাছে পেতে পারি। তবে এর আর একটা দিক দেখতে হবে। আজ রাজপ্রাসাদ সরকারী দপ্তরখানায় পরিণত হওয়ার দরুণ অনেক মানুষ স্বাধীনভাবে সেখানে যাওয়া আসা ক'রতে পারে আর সেই সঙ্গে হয়ত একটীবার পুরাতনের কথা ভাববার সুযোগ পায়।

আর সময় নাই। বেলা এগিয়ে চ'লেছে—সময়ের শাসন আমাদের মানতেই হবে। সকলে মিলে ফিরে আসি মাদুরা সহরের একটী ভোজনাগারে। সেখানকার কাজ শেষ ক'রে সোজা আমাদের নির্দিষ্ট হোটেলে চ'লে এলাম। মাত্র কিছুক্ষণের অবসর তারপর আবার নূতন যাত্রার আয়োজন। এ যেন সেই উদ্দাম পথিকের পথ চলা— শুধু নূতনকে দেখা, নূতনকে জানার ব্যাকুলতা।